ইতিবৃত্তিকা

[ম]ধ্য যুগ

সপ্তম শ্রেণী

বিমলাপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সকল বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর জন্য নতুন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত **ইতিহাস** পুস্তক [*T. B. No/VII/H/62/81* তারিখ ৮. ১. ৮১ দ্রষ্টব্য]

ইতিবৃত্তিকা

সভ্যতার ইতিহাস ঃ মধ্যযুগ

সপ্তম শ্রেণী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যাপক
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
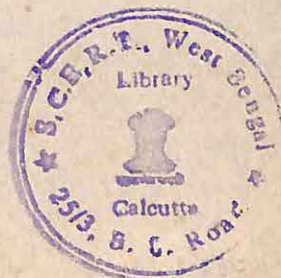
শৈব্যা পুস্তকালয় ৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভূমিকা

নতুন পাঠক্রম অনুসারে মধ্য যুগে মানব সভ্যতার ইতিহাস সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য। এর মধ্যে য়ুরোপীয়, ইসলামী, ভারতীয় এবং চীন-জাপানের সভ্যতার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীনকালের অবসানে মধ্য যুগে কি ধরনের সভ্যতা বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করেছিল, ছাত্রছাত্রীদের তার পরিচিতি দেওয়া পাঠক্রমের উদ্দেশ্য। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে মধ্য যুগের সভ্যতার এই বিবরণ শুধু নতুন ও অপরিচিত বলে নয়, ধারণা করার পক্ষেও কিছু কঠিন লাগতে পারে। এখানে এমন কয়েকটি সংজ্ঞা আছে, যেমন সামন্ত প্রথা ও সামন্ত সমাজ যেগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মালে এ যুগের সভ্যতার বৃত্তান্ত অসার্থক। সেই ধারণা সৃষ্টি করতে হলে, ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তথ্যের ভার বাড়িয়ে নয়, ছবি ও মানচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। বিষয় ধারণাকে প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য ভাবে পরিস্ফুট করতে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা তা গ্রহণ করবে, আমার বিশ্বাস।

বই লিখতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে যে মানব সভ্যতার ইতিহাস অবশ্যই স্থান ও কালনির্ভর এবং আপন আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন দেশের সভ্যতার মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণ ও মিল রয়েছে, যেমন সমাজবিন্যাসে শ্রেণীবিভাগে ও অর্থব্যবস্থায়। পরস্পরের মধ্যে সেই মিলগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা দরকার। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বায়ুভূত নিরালম্ব পদার্থ নয়। তার বীজ ও শিকড় মাটিতেই, মানুষই তাকে লালন পালন করেছে কৃষি ও শিল্প কাজের মাধ্যমে, রূপ দান করে চারুকলায় উদ্‌বৃত্ত অর্থ ও অবকাশের সাহায্যে।

এ সবের জন্য প্রয়োজন কিছু বিশদ ব্যাখ্যার এবং দরকার মতো পুনরুক্তির, যাতে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণাগুলি বসে যায়। সকলেই জানেন, বিনা ভূগোলে ইতিহাস পড়ানো অসার। তাই নির্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ মানচিত্র ও বেশী ছবি দিতে হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগে এবং শিল্পী-কারিগরদের সৃষ্টির নমুনা দেখে অপরিচিত সভ্যতার একটা সামগ্রিক ছবি তারা দেখতে পায়। প্রকাশক এ বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন, স্বীকার করি। শেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে কোনও বই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হয় না। তাই তাঁরা যদি এ বইয়ের ত্রুটি ও অভাবগুলি উল্লেখ করে উৎকর্ষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায় জানিয়ে দেন, তাহলে উপকৃত হব।

বালিগঞ্জ, ১৯৮০ গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

'মধ্য যুগ' শব্দের ব্যাখ্যা

প্রাচীন যুগে সভ্যতার ইতিহাস পড়ার পর মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোথায় তার শেষ আর পরবর্তী যুগের আরম্ভই বা কোন সময়ে? এটা কি সাল-তারিখের নিশানা দিয়ে মাপা যায়, না কি সঠিক ভাবে বলা চলে—এইখানে একটি যুগের অন্ত, এইখানে আর একটি যুগের সূত্রপাত? মানব সভ্যতার বিপুল ধারা, যা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচিত্র রূপে বয়ে এসেছে, তা হঠাৎ এক সময়ে এসে শেষ হয়ে গেল কোন চিহ্ন বা ছাপ না রেখে, তা বলা যায় না। সভ্যতার স্রোত হয়তো কোন কারণে রুদ্ধ হয়েছে কিন্তু নিঃশেষ হয় নি। পরে সেই স্রোত আবার ভিন্ন খাতে নতুন শক্তিতে বইতে সুরু করেছে।

যুগান্তরের লক্ষণ ঃ প্রাচীন যুগে যে ধরনের সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা চলছিল, তার মধ্যে অনেক অভাব দেখা যেতে লাগল। তাই সমাজের ও মানুষের প্রয়োজন পুরানো কাঠামো ধীরে ধীরে বদলাতে থাকল। ক্রমশঃ সেই প্রয়োজনের তাগিদে পরবর্তী যুগে—পৃথিবীর ইতিহাসে যাকে 'মধ্য যুগ' বলা হয় সেই সময়ে—কতকগুলি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। বিশেষ করে, জমির ব্যবস্থা, চাষবাস, পণ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক বিষয়গুলি নিয়ে। সুতরাং পুরানো সমাজের চেহারা, বৈশিষ্ট্য, রীতি-নীতিরও পরিবর্তন সুরু হল। আর নতুন সমাজ ও অর্থব্যবস্থার লক্ষণগুলি ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠল। অতএব পুরাতনের মধ্যেই নতুনের বীজ থাকে। এক বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এই কথাই বলেছেন যে বিগত যুগের সামাজিক ও আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা বহু দিন ধরে অনেকটা অলক্ষ্য ভাবেই আগামী যুগের মধ্যে মিশে গিয়ে তাকে অন্যরূপ দেয়।

যুগ-ভাগের লক্ষণ ঃ আর সত্যই তাই। প্রাচীন মধ্য আধুনিক, এই রকম যুগ-বিভাগ আমরা ইতিহাস পড়া ও বোঝার সুবিধার জন্য করে থাকি। যেমন বুঝতে পারি যে প্রাচীন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার মূলে ছিল দাসত্ব প্রথা। আবার মধ্যযুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সামন্ত প্রথার উপর তৈরি সামন্ত সমাজ। আর বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার মনের বিকাশ, নানা আবিষ্কারের ফলে বাণিজ্যের প্রসার উপনিবেশ বিস্তার এবং ধনসঞ্চয়।

ইতিহাস হল প্রকৃত পক্ষে মানুষ ও তার অগ্রগতির গোটা ইতিহাস। একটি বড় নদী দেখে আমরা যেমন সন্ধান করি কোথায় তার উৎস, কোনটি তার মধ্য অংশ আর নানা বাঁক ঘুরে কোন দিকে তার মোহানা, ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা তেমনই তার বিভিন্ন পর্বগুলির লক্ষণ ও চেহারা মিলিয়ে 'প্রাচীন' 'মধ্য' 'আধুনিক' এইভাবে নামকরণ

করি। কিন্তু ঐ নামকরণ সব সময়ে যথার্থ ও সম্পূর্ণ হয় না। নদীর বেলায় তার গতি ও প্রবাহটা যেমন আসল কথা ইতিহাসেরও অনেকটা তাই। নানা অভিজ্ঞতা নানা ঘটনার মোড় ঘুরে মানুষ তার উন্নতির গতিপথ কিভাবে প্রশস্ত করেছে সেটাই মূল কথা।

মধ্য যুগ কাকে বলে : ঐতিহাসিকরা মোটামুটি ভাবে মধ্য যুগের সময়-কাল

অনুমান করে বলেছেন যে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে পনেরো শতকে য়ুরোপের 'নব জাগরণ' যখন দেখা দিল, তখন পর্যন্ত যে যুগ বিস্তৃত ছিল তাকে 'মধ্য যুগ' বলা যায়। অর্থাৎ প্রাচীন আর বর্তমান যুগের মাঝামাঝি সময় হল মধ্যযুগ। এই যুগের পরমায়ু নিতান্ত কম নয়, প্রায় হাজার বছর। য়ুরোপে গ্রীস ও রোম, উত্তর পূর্ব আফ্রিকায় মিশর, মধ্য প্রাচ্যে সুমের ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়া এবং ইরান আর প্রাচ্য ভূখণ্ডে ভারত ও চীন, এই দেশগুলি ছিল প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এদের সংস্পর্শে ও প্রভাবে পরবর্তী অনেক জাতি উন্নত হতে শেখে। সেই উন্নতির কাল 'মধ্য যুগ' অনেকটাই দীর্ঘ।

মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগ ঃ তা ছাড়া, আমরা যাকে 'মধ্য যুগ' বলে থাকি, সেই সময়ে যারা বাস করত তারা কি নিজেদের মধ্য যুগের মানুষ বলে ভাবত ? কখনোই নয়। তাদের কাছে সময় তো একটানা। আমাদেরই মতো তারাও যা দেখেছে ভেবেছে ও করেছে, যে দেশ ও সমাজে তারা বাস করেছে, সে সবই তাদের চোখে বর্তমান এবং জীবন্ত সত্য বলেই পরিচিত ছিল। তফাত এই যে আধুনিক মানুষের কাছে বাইরের পৃথিবী অনেক নিকটে এসেছে, বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। 'মধ্যযুগের' মানুষের কাছে জগৎ ছিল অনেকটা সীমাবদ্ধ। তবে তাদেরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৌতূহল ছিল, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা ছিল। তারা ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পকলার যথেষ্ট চর্চা করেছে এবং দুর্গ-প্রাসাদ ও গির্জা তৈরির কাজে নতুন রীতি ও উপায় উদ্‌ভাবন করে গেছে। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এ সবেরই দাম আছে, কারণ 'মধ্য যুগের' উন্নতির সিঁড়ি বেয়েই 'বর্তমান' যুগের মানুষ এতটা এগুতে পেরেছে।

মধ্য যুগের আরম্ভ, য়ুরোপ ঃ ভূমধ্যসাগরকে ঘিরে রোমান সাম্রাজ্য কত বিশাল ছিল, পূর্বপৃষ্ঠার মানচিত্রটি দেখলে তা বোঝা যায়। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ঐশ্বর্য ও সভ্যতার গৌরবে ঐ সাম্রাজ্যের যে জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল, কালক্রমে তা নষ্ট হয়ে গেল। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। সম্রাট ও শাসকদের যথেচ্ছাচার, বড় মানুষের হাতে অর্থ ও প্রতিপত্তি, খাজনার চাপে সাধারণ প্রজাদের দুর্গতি আর ক্রীত-দাসদের নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা—এই সব কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ঘনিয়ে ওঠে। তা দমন করার জন্য সর্বদা সৈন্যসামন্ত মজুত রাখতে হত। যে রোমানদের বীরপুরুষ বলে এককালে খ্যাতি ছিল তারা এখন অলস অকর্মণ্য হয়ে ভাড়াটিয়া সৈন্যদের ওপর নির্ভর করতে শিখল। সস্তায় কেনা বাজারের ক্রীতদাসদের ওপর সমস্ত পরিশ্রম চাপিয়ে দিয়ে রোমের অভিজাত দল বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে রইল। রোমের এই ক্রমিক অধঃ-পতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হানাদারদের বার বার আক্রমণ। সব চেয়ে ভীষণ হুনদল আর গথ ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি উপজাতিদের ক্রমাগত আঘাত রোম সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

ভারতে ঃ প্রায় একই সময়ে ভারতেও সমৃদ্ধ ও শক্তিমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। কারণ ও উপলক্ষ্য অনেকটা এক ধরনের। দুর্ধর্ষ হুনদল একাধিক বার আক্রমণ চালিয়ে ভারতের ভিতরে প্রবেশ করে পাঞ্জাব ও মালব প্রদেশের কিছু অংশ দখল করে

নেয়। বিদেশীদের হানা গৃহবিবাদ ও রাজ্যভাগের ফলে গুপ্ত রাজার হীনবল হয়ে পড়েন এবং শেষ দিকে কয়েকজন কেবল নামেই রাজা ছিলেন। ক্রমে বিখ্যাত গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে থাকলে কনৌজ, মালব, সৌরাষ্ট্র, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হল। পণ্ডিতরা বলেন, এই অবনতি ও বিশৃঙ্খলার সময় থেকেই ভারতে মধ্য যুগের সূত্রপাত। মধ্য যুগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল সামন্ত প্রথা ও সমাজের উদ্ভব, য়ুরোপের ইতিহাসে যাকে 'ফিউডালিজম' বলা হয়। কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে পঞ্চম শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে ঐ সামন্ত প্রথার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। 'মহাসামন্ত', মহাপ্রতীহার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের উল্লেখ, বশ্য কিন্তু স্বাধীনপ্রায় রাজাদের সঙ্গে মৈত্রী, সমাজে উচ্চবর্ণ ও অভিজাতদের প্রাধান্য, ভূমিদানের রীতি—এই রকম প্রমাণ থেকে তাঁরা মনে করেন যে গুপ্ত রাজ্যে মধ্য যুগের সামন্ত প্রথা ও সমাজ সম্পর্কের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

বিভিন্ন দেশে মধ্য যুগের ব্যাপ্তিকালঃ এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যযুগের আরম্ভ ও ব্যাপ্তি একই সময়-কালের মধ্যে ঘটেনি। য়ুরোপে, ভারতে, চীন-জাপানে মধ্য যুগের সূত্রপাত ও বিস্তার বিভিন্ন সময়ে হয়েছিল, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ দেশ-বিদেশে উন্নতির ধারা ও গতির হার সমান ছিল না। চীনদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। সেই প্রাচীন যুগের শেষ ভাগ চীনে 'ফিউডাল' বা সামন্ত যুগ বলে ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। ভারতে সামন্তসমাজের চেহারা এর অনেক পরে দেখা যায়, আর য়ুরোপেও তাই। আসল কথা, সব দেশের সমাজগঠন ও পরিবেশ এক ছাঁচের নয়। তাই সমাজের ও রাষ্ট্রের ভিতরকার পরিবর্তন সমান তালে চলে নি। কোথাও তা দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে, কোথাও বা দেরিতে অনেকটা সময় নিয়ে হয়েছে। সুতরাং মধ্য যুগের আকৃতি প্রকৃতি ও ব্যাপ্তকাল পৃথিবীর সকল দেশে এক রকম নয়। তবু মধ্য যুগে পরিচিত সভ্য জগতের অনেক অঞ্চলে স্থানীয় প্রভেদ থাকলেও কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

তা হলে মোট কথা হল ঃ পৃথিবীর সর্বত্র 'মধ্য যুগ' একই সময়ে সুরু বা শেষ হয় নি, যেমন বলা যায় ভারতের ইতিহাসে আঠারো শতক পর্যন্ত মধ্য যুগের লক্ষণ বর্তমান ছিল। দ্বিতীয়তঃ সকল দেশে সামাজিক পরিবর্তন এক সময়ে ঘটে নি। তাই বিভিন্ন দেশে মধ্য যুগের অর্থ, স্থায়িত্ব, উন্নতির গতি আলাদা ধরনের। তৃতীয়তঃ, যেসব লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নতুন বলে মনে হয় এবং মধ্য যুগকে চিহ্নিত করে, সেগুলি হয়তো আসলে একেবারে নতুন নয়। তার বীজ বা আভাস পূর্বযুগেই ছিল। তাই কোন যুগে আকস্মিক ছেদ পড়ে না, কোন ঘটনা বা পরিবর্তন হঠাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয় না। চতুর্থ ঃ সভ্যতার ইতিহাসে মধ্য যুগের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ও তাৎপর্য আছে। মধ্য যুগ প্রাচীন ও আধুনিক কালের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি' সবদিকে থেকে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। ইতিহাসে যুগ ভাগ করা হয় কেন ?
২। কয়টি যুগের কথা জানো ? তাদের নামকরণ কি যথার্থ ?
৩। 'পুরাতনের মধ্যেই নূতনের বীজ থাকে', এর মানে কি ? তাদের তফাত কোথায় ?
৫। 'মধ্য যুগ' কাকে বলে ? পণ্ডিতরা তার কি সময়-কাল স্থির করেছেন ?
৬। পৃথিবীর সর্বত্র কি একই সময়ে মধ্য যুগের আরম্ভ ও ব্যাপ্তি ? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বল, কেন নয় ?
৭। মধ্য যুগের বিশিষ্ট দান কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ?
৮। সভ্যতার ইতিহাসে মধ্য যুগের ভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা কর ।

অশুদ্ধি সংশোধন কর্ ঃ

(ক) মধ্য যুগ বলতে আমরা বুঝি সপ্তম শতকের গোড়া থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ ।
(খ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই সময়ে একই ধাঁচে মধ্য যুগ দেখা দিয়েছিল ।
(গ) মধ্য যুগের অবসান কাল ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিম য়ুরোপে মধ্য যুগের সূচনা

বিভিন্ন 'বর্বর' দল ঃ বাইরে থেকে হানাদার দল বহুবার রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে ও তার ধ্বংসের কারণ হয়। মানচিত্রে নানা জাতির আক্রমণ পথ এবং পশ্চিম য়ুরোপে তাদের বসতি ও রাজ্য স্থাপন দেখানো হয়েছে। এই সব বিদেশী উপজাতি
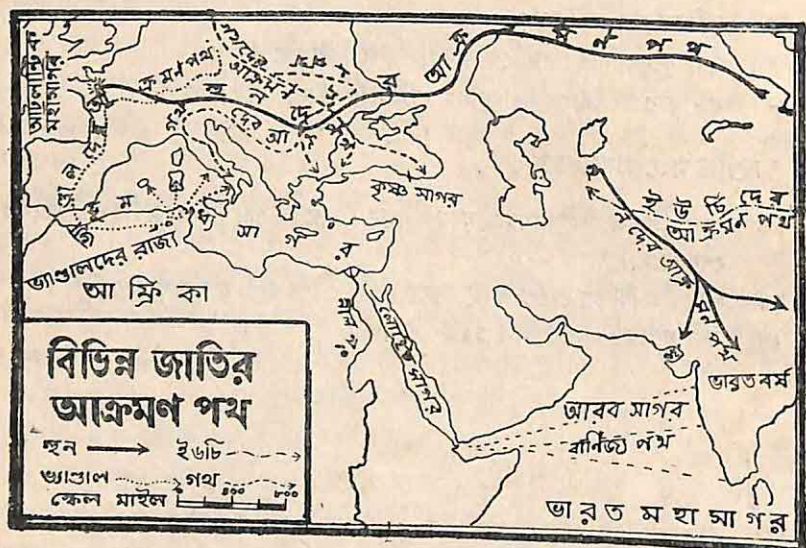
ছিল **টিউটনিক বা জ্যর্মন** জাতির লোক। রোমানদের মত তারা সুসভ্য ছিল না। তাই রোমের লোক এদের 'বর্বর' জাতি বলত। এদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ ও লম্বার্ড প্রভৃতি উপজাতিরা সে সময়ে খুব দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। **জুলিয়াস সীজারের** লেখা বিবরণ আর রোমান ঐতিহাসিক **তাকিতুস**-এর **'জ্যর্মেনিয়া'** বই থেকে আমরা তাদের অনেক কথা জানতে পেরেছি। আমরা যে সময়কার কাহিনী বলছি, সে সময়ে মধ্য য়ুরোপের জার্মন উপজাতিগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম-দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অ্যাঙ্গল্, জুট ও স্যাক্সনরা সমুদ্র পার হয়ে ব্রিটেনে গিয়ে বসবাস সুরু করে। এই অ্যাঙ্গল থেকে ইংলণ্ড নামের উৎপত্তি। ফ্রাঙ্করা সরে এসে বর্তমান ফ্রান্সে স্থিতিলাভ করে। আর গথ ও ভ্যাণ্ডালের দল অস্ট্রিয়া ও ইটালির মধ্যে প্রবেশ করে রোম আক্রমণ এবং অবশেষে দখল করে নেয়।

তাদের আচার-ব্যবহার ঃ টিউটন জাতির এই দলগুলি কখনও বিরোধ, কখনও বা পরস্পর ভাব করে ছোট ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করত। এককালে তারা বল্‌টিক

সমুদ্রের নিকট অঞ্চলে থাকত। এরা আর্যগোষ্ঠীরই লোক, আর্য ভাষাই ব্যবহার করত। ক্ষেত বা প্রান্তরের মধ্যে ছোট ছোট গ্রামে এদের বাস, গ্রীক ও রোমানদের মত নগর পত্তন করে তারা সুসভ্য নাগরিক হতে শেখে নি। যুদ্ধবিগ্রহ করে গায়ের জোরে তারা দেশ ও জমি দখল করত। প্রথম দিকে কাঠের ফ্রেম ও চালের ছাউনি দিয়ে তারা একরকম মাটির ঘর বানিয়ে বাস করত। গ্রামের চারদিকে মোটা খুঁটি পুঁতে তারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ রোধ করত। ক্রমশ তারা চাষবাসের কাজ শিখল, শস্য ও সবজির ফলন করল। জমি চাষ করবার জন্য তারা ষাঁড় দিয়ে লাঙল টানত। গরু, ভেড়া ও ঘোড়াই ছিল তাদের প্রধান গৃহপালিত পশু। ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে পরস্পর দৌড়-প্রতিযোগিতা আর জুয়া খেলা তারা খুব পছন্দ করত। জুয়ায় যারা হারত তারা অনেক সময় দাসত্ব স্বীকার করত। মোটের উপর কষ্ট ও পরিশ্রম করে জীবন যাপন করলেও তাদের প্রকৃতি ছিল সুখী ও সরল। একত্র বসবাস করার ফলে সমাজ জীবনে কিছু পরিমাণে নিয়ম ও শৃঙ্খলা এল বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে দেহবলই ছিল প্রধান বল। লুটতরাজ করে অপর সম্প্রদায়ের জমিজমা কেড়ে নেওয়াই ছিল সাধারণ রীতি। সমাজে সবচেয়ে বেশী সম্মান পেতেন পরিবারের যিনি কর্তা। এই গোষ্ঠীপতিরাই ছিলেন সর্বেসর্বা। এক কথায় জার্মনদের আদি সমাজ ছিল কৃষিপ্রধান। গ্রাম ও পরিবারকে কেন্দ্র করে পিতৃপুরুষের প্রাধান্যে তারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করত।

সমাজ জীবন ও ধর্ম-বিশ্বাস ঃ এদের সমাজে স্ত্রীলোকেদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাঁরা বেশ সাহসী ও কর্মিষ্ঠা ছিলেন। জুলিয়াস সীজার লিখেছেন', অনেক বিষয়েই রমণীদের পরামর্শ নেওয়া হত। পুরুষদের স্বভাব ছিল বীরোচিত। কখনও ঘোড়ায় চড়ে কখনও পদাতিক বেশে ঢাল তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে তারা যুদ্ধ করত। কিন্তু যুদ্ধপ্রিয় জাতি হলেও সমাজ-গঠন ও দেশ-শাসনের ব্যবস্থাও তারা করেছিল। গ্রীক ও রোমানদের মত উন্নত ও মার্জিত তারা ছিল না সত্য, কিন্তু মনে রাখতে হবে, তারা সবে নতুন সভ্যতা শিখছে। বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে সেখানে বসবাস করে সমাজ শাসনের নতুন ভিত্তি স্থাপন করছে। তারা উদ্যমী ও শক্তিশালী। অপরদিকে রোমান সমাজে ও রাষ্ট্রে তখন ক্ষয় সুরু হয়েছে। সর্বত্র দুর্নীতি ও অনাচার অবনতির চিহ্ন পরিস্ফুট। তাই, পতনোন্মুখ রোম সাম্রাজ্য সহজেই ধ্বংস হল আর জার্মন উপজাতিরা সেই সুযোগে য়ুরোপের নতুন সমাজ-জীবনের বনিয়াদ গঠন করল। 'বর্বর' বলা হলেও এদের সৃষ্টিশক্তি ও সজীবতা ছিল। রোমান সভ্যতার প্রাচীন ধারার সঙ্গে আপনাদের রীতিনীতি মিশিয়ে তারা য়ুরোপে একটি মিশ্র সভ্যতার পত্তন করেছিল। অনেকেই পরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং তার প্রভাবে আরও সভ্য ও মার্জিত হয়।

এদের সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল—অভিজাতের দল, স্বাধীন প্রজা ও গোলাম। শাসনের সুবিধার জন্য দেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হত। সবচেয়ে ছোট হল গ্রাম, তার একটি নিজস্ব সভা ছিল। তার উপরে 'হাণ্ড্রেড', সেখানেও একটি সমিতি। সকলের উপরে জাতীয় সভা। দেশের কোন যোগ্য পরিবার থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত পুরুষকেই

দলপতি বা রাজা হিসাবে নির্বাচন করা হত। তাঁর সঙ্গে সর্বদাই একদল অনুচর থাকত, এরাই পরে সামন্ত বলে পরিচিত হয়। গোড়ার দিকে টিউটনিক সমাজে সাধারণ মানুষের

বেশ অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল ; তাদের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল সরল ও গভীর। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তারা উপাসনা করত। প্রধান দেবতার নাম ছিল 'ওডিন' ও 'থর'। এই

থেকেই ইংরেজি বুধ বৃহস্পতিবারের নামকরণ। জার্মন জাতি পরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নম্র ও মার্জিত হয়। এদের মধ্যে গথরাই প্রথম দীক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। পণ্ডিতরা বলেন, এটা **'মাইগ্রেশনের যুগ'** বা দেশান্তর গমনের কাল। এই সময় এক একটি উপজাতি তাদের সমস্ত পরিবার ও গৃহপালিত পশু নিয়ে ঘোড়ায় টানা **'ওয়্যাগন'** গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে উঠে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করত। খাদ্যের অভাবই তার প্রধান কারণ। য়ুরোপের উত্তর পূর্ব ভাগের চেয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের জমি ও জলবায়ু আরও ভাল। তাই বসবাসের সুবিধার জন্য তারা এই দিকে আকৃষ্ট হল। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ও সীমান্তে প্রথমে তারা বসতি সুরু করল। কেউ কেউ ইটালির মধ্যে প্রবেশ করে রোমান সৈন্যদলে ভর্তি হল। আবার কেউ কেউ অন্য উপজাতির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রোমান রাজ্যে ঢুকে হানা দিতে লাগল এবং জায়গা ও জমি দখল করে সেইখানেই বসে গেল। এই ভাবেই উপজাতিরা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে বাসের উপযোগী নতুন জায়গা দখল করে।

হুন আক্রমণ ঃ যে সব বর্বর জাতি রোম ধ্বংস করে, তাদের মধ্যে হূনরাই ছিল সবচেয়ে হিংস্র ও ভীষণ। এরা তাতার বা মোঙ্গল জাতীয় যাযাবর। তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের অনেক ভয়াবহ কাহিনী প্রচলিত আছে। এককালে হূনদল মধ্য এসিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু পূর্বদিকে চীন সাম্রাজ্য, সেদিকে অগ্রসর হতে না পেরে তাদের একদল বাসভূমি ত্যাগ করে য়ুরোপে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে রোম সাম্রাজ্যে উপস্থিত হয়। আর এক হূনদল দক্ষিণে নেমে এসে ভারতে ঢুকে পড়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। পশুচারণের জন্য উপযুক্ত জমির অনটন, খাদ্যের অভাব, লোক বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে এরা মধ্য এসিয়া থেকে বেরিয়ে পড়ে। সভ্য সমাজের সঙ্গে প্রথমে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। ক্রমশঃ লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হলে জার্মনরা তাদের উপদ্রবে দেশ ছেড়ে সরে যায় এবং রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানে শান্তিভঙ্গ করে। হূনরা পুরোপুরি যাযাবর জাতি। ঘোড়ার পিঠেই তাদের বেশীর ভাগ সময় কাটত। তাই অশ্বচালনায় তারা খুব পটু ছিল। ছোটবেলা থেকে হূনরা কর্মঠ এবং যুদ্ধনিপুণ হতে শিখত। তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ আর পশুচারণ ছিল তাদের পেশা। এক জায়গায় পশুদের খাদ্য শেষ হয়ে গেলে তারা দলবল নিয়ে আবার অন্য জায়গায় চলে যেত।

গথ ও ভ্যাণ্ডাল ঃ হূন জাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে গথ নামে এক জার্মন দল পশ্চিম ও দক্ষিণ য়ুরোপে নেমে আসে। এক কালে তারা ভল্গা নদীর তীরে ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে জলদস্যুগিরি করে বেড়াত। এখন হূনদের ভয়ে তারা দানিয়ুব নদী পার হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের এলাকায় প্রবেশ করল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস সুরু করল। গথদের মধ্যে দুটি দল ছিল—**ভিসিগথ** অথবা **পশ্চিম গথ** এবং **অস্ট্রোগথ** অথবা **পূর্ব গথ**। গথ ছাড়া **ভ্যাণ্ডাল** নামে আর একটি উপজাতিও রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ

করে। ভিসিগথরা স্পেন ও দক্ষিণ গলে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করে এবং হুন বীর অ্যাটিলাকে পরাস্ত করতে রোমকে সাহায্য করে। আর আস্ট্রোগথরা ইটালিতে **থিওডরিকের** অধীনে এক নতুন রাজ্য গড়ে।

এই সব জার্মন জাতি সকলেই শত্রুভাবে আসে নি এবং গথরা একেবারে অসভ্য ছিল না। তারা খ্রীষ্টান হয়েছিল এবং তাদের দলপতি **অ্যালারিক** মোটেই বর্বর ছিলেন না। অ্যালারিক তিনবার রোম আক্রমণ করেন। তিনি খুব শক্তিশালী ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। প্রথমবার অনেক সোনা রূপা, রেশম ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে তিনি রোমের অবরোধ সরিয়ে নেন। রোমের দূতরা তাঁকে বলেছিল, 'আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, সংখ্যাতেও বেশী। আপনি ফিরে যান।' অ্যালারিক তখন বলেন, 'ঘাস যতই বড় ও ঘন, কেটে ফেলার ততই সুবিধা'। দূতরা সুর নামাল, বলল, 'কি পেলে আপনি শান্ত হয়ে চলে যাবেন?' অ্যালারিক উত্তর দিলেন, 'তোমাদের যা ধন দৌলত আছে, সব…' দূতরা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তা হলে আমাদের রইল কি?' অ্যালারিক বিদ্রূপভরে জবাব দিলেন, 'কেন, তোমাদের প্রাণ।' যাই হোক রোমের সম্রাটের সঙ্গে তিনি আপস করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে অ্যালোরিক অবশেষে রোম আক্রমণ ও লুঠ করেন। রোমের ঐশ্বর্য ও গৌরব ধ্বংস হল এবং তার কিছুকাল পরেই রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটল। গথদের আক্রমণে রোম সর্বস্বান্ত হয় সত্য। কিন্তু ইটালিতে সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছিল অ্যাটিলার আক্রমণে।

অ্যাটিলা ঃ অ্যাটিলা কেবল হুনদের দলপতি ছিলেন না, অন্যান্য অনেক অঞ্চল তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করত। তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল মধ্য এসিয়া থেকে য়ুরোপে রাইন নদী পর্যন্ত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে তিনি কৃষ্ণ সাগর থেকে বল্কান উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে লুটতরাজ করেন এবং প্রায় সত্তরটি নগর ধ্বংস করেন। কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল শহর পর্যন্ত অগ্রসর হলে সম্রাট থিওডোসিয়ুস অ্যাটিলাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদায় করেন। তিনি অ্যাটিলাকে হত্যা করবার চেষ্টাও করেছিলেন। কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলের এক দূত অ্যাটিলার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। অ্যাটিলা যখন গল দেশ আক্রমণ করেন, তখন রোমান ও গথ সৈন্যদল একত্র হয়ে অ্যাটিলাকে হারিয়ে দিয়েছিল। এই পরাজয়ের পর অ্যাটিলা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইটালির দিকে অগ্রসর হন। সেই অভিযানে ইটালির উত্তর ভাগে অনেক নগর বিধ্বস্ত হয়, অনেক ইমারত ও প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়। তারপর তিনি রোমে পৌঁছুলেন এবং যে কারণেই হোক, শহরটিকে ধ্বংস না করে সন্ধির সর্ত মেনে চলে যান।

কিন্তু পরের বছর ইটালিতে দ্বিতীয় অভিযান করবার আগে একটি বিরাট ভোজ হয়। উৎসবের শেষে অ্যাটিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু হয়। পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলি তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। অ্যাটিলা য়ুরোপে এতই ভয়ের কারণ হয়েছিলেন যে তাঁকে ভগবানের 'শাস্তিদূত' বলা হত! অ্যালারিক রোম দখল করেছিলেন, অ্যাটিলা রোমকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু আফ্রিকার উপকূলে ভ্যাণ্ডালদের রাজা

গেনসেরিক রোমকে রেহাই দেন নি। নগরবাসীদের হত্যা না করে অবরুদ্ধ রোমের অজস্র ধনসম্পদ নিয়ে তিনি তাকে নিঃস্ব করে যান। সেই থেকে 'ভ্যাণ্ডাল' কথাটির মানে দাঁড়াল, যে ইচ্ছাকৃতভাবে মূল্যবান সামগ্রী নষ্ট করে দেয়। যাই হোক, এই ভাবে 'বর্বরদের' আক্রমণে য়ুরোপ বিপর্যস্ত হয়। এতদিন ধরে বিভিন্ন দেশ রোম সাম্রাজ্যের অধীন থেকে অনেকটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, এখন তা নষ্ট হয়ে গেল। য়ুরোপের প্রাচীন সমাজে ও সভ্যতায় প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। রোমের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে এখন এক একটি অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল। এইভাবে স্পেনে গথরা এবং ফ্রান্স ও জার্মানিতে ফ্রাঙ্করা তাদের রাজ্য স্থাপন করল।

ভারতের ইতিহাসেও তখন অনেকটা একই অবস্থা। রোম যখন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি, উত্তর ভারতে তখন গুপ্ত সম্রাটদের আধিপত্য। আবার রোম সাম্রাজ্য যখন পতনম্মুখী, গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও তখন আধাগতি। পরিচিত পৃথিবীর দুই দিকে দুটি বিশাল সমৃদ্ধ সভ্যতার অবসান হল। সভ্যতার ইতিহাসে এই দুটি সমকালিক ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয় কারণ তাদের ফল ও প্রতিক্রিয়া অনেক দিন চলেছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কাদের 'বর্বর' জাতি বলা হয়? কেন বলা হয়? তারা কি সত্যিই বর্বর ছিল?

২। 'গথ'রা কোথায় রাজ্য স্থাপন করে? তাদের কয়টি শাখা ছিল?

৩। 'ভ্যাণ্ডাল' ও 'হুন'—এদের মধ্যে কারা বেশী ভীষণ মনে হয়? তাদের দু জন দলপতির নাম বল।

৪। 'টিউটন'রা কোন জাতি? তাদের আচার-ব্যবহার কেমন ছিল?

৫। 'মাইগ্রেসনের যুগ' বলতে কি বোঝ? সে সময়ে কি হয়েছিল?

৬। কোন কোন বই থেকে জার্মান বা টিউটনদের বৃত্তান্ত জানা যায়? তাদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

৭। কোন জাতির নাম থেকে ইংল্যাণ্ড নামের উৎপত্তি?

৮। অ্যাটিলা কাদের দলপতি ছিলেন?

এই উক্তিগুলির মধ্যে কি ভুল আছে?

১। অ্যালারিক অস্ট্রোগথদের রাজা ছিলেন।

২। অ্যাটিলা রোম শহর পুড়িয়ে দেন।

৩। ভিসিগথদের নেতা ছিলেন গেনসেরিক।

৪। ভ্যাণ্ডালরা সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

৫। 'থর', 'ওডিন' হুনদের দুই প্রধান দেবতা।

সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ ঃ

(১) থর (২) ওডিন (৩) থিওডরিক।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) রোমান ঐতিহাসিক তাকিতুস-এর —— বই থেকে আমরা বর্বরজাতিদের অনেক কথা জানতে পেরেছি।

(খ) ——থেকে ইংল্যাণ্ড নামের উৎপত্তি।

(গ) গথদের মধ্যে দুটি দল ছিল —— অথবা পশ্চিম গথ এবং —— অথবা পূর্ব গথ।

তৃতীয় অধ্যায়

য়ুরোপের তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ'

পশ্চিম জগতে অনেকের মনে বহুদিন এই ধারণা ছিল যে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল 'বর্বর' জাতিদের আক্রমণের ফলেই। আর রোমের ধ্বংস হওয়ার পর য়ুরোপের ইতিহাসে নামল 'ডার্ক এজ' বা 'অন্ধকার যুগ'। যেন সভ্যতার আলো নিভে গেল, যে আলো প্রথম জ্বালিয়েছিল প্রাচীন গ্রীকরা এবং যা জ্বালিয়ে রেখেছিল রোমানরা। অর্থাৎ চারদিকে নৈরাজ্য আর বিশৃঙ্খলা, কোথাও শক্ত সমর্থ কেন্দ্র-শক্তি নেই। খ্রীষ্টান ধর্ম জগৎ তখনও যথেষ্ট সংঘবদ্ধ হয়নি, 'পেগান' বা অ-খ্রীষ্টানদের বিরোধিতাও থামেনি। এ সময়ে নতুন খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার খুব আশাপ্রদ ছিল না। এই সব কারণে ধারণা জন্মেছিল—যে গ্রীক রোমান সভ্যতার কাছে পৃথিবী চিরকালের জন্য ঋণী, তা বর্বরদের হাতে নিশ্চিহ্ন হল। তাই মধ্য যুগের সুচনাকে 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করা হল।

কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। কেন নয়, তা বলছি। যাদের বর্বর জাতি বলা হয়, তারা যে পুরো অসভ্য ছিল না আগেই তা বলেছি। রোমান সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরালেও তারা রোমান সভ্যতাকে বর্জন করে নি। বরং তাই থেকে তারা আইন ও শৃঙ্খলা শেখে এবং কালক্রমে নিজেদের আরও সভ্য ও উন্নত করে তোলে। তা ছাড়া, পঞ্চম শতকে তারা যে হঠাৎ আল্‌পস পর্বত পার হয়ে এসে উত্তর ইটালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং রোমকে ধ্বংস করল, এ ধারণা মোটেই সত্য নয়। এই 'বর্বর' জাতির অনেক লোক আগে থেকেই রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিল কখনও ক্রীতদাস রূপে, কখনও সৈনিক হয়ে, কখনও বা ব্যবসা সূত্রে। কোন কোন দল আবার সীমান্ত প্রদেশে উপনিবেশ বসতি স্থাপন করেছিল। সুতরাং বাইরের লোক এ ভাবে অনুপ্রবেশ করায় সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। পরে হূনদের তাড়ায় তারা রোম সাম্রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে আর রোমের অতুল ঐশ্বর্য ও শস্য-সম্পদই প্রধানতঃ তাদের আকৃষ্ট করে। লুঠতরাজই ছিল তাদের মূল প্রলোভন।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলে বিবেচনা করেন না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক ওমানকে এক ছাত্র প্রশ্ন করেছিল, 'এটা কি অন্ধকার যুগ?' অধ্যাপক ঈষৎ হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'না—অন্ধকার তোমাদের মনে।' বিদ্রূপ হলেও কথাটা সত্য। কারণ এই যুগ সম্বন্ধে ভুল ধারণার প্রকৃত কারণ হল অনেক তথ্য আমরা জানতাম না এবং যেটুকু জানা ও শোনা ছিল সেগুলিই ভাল ভাবে বিচার করা হয়নি। চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত সময়পর্বে সভ্যতার আলো একেবারে নিভে যায় নি। রোমের পতন হলে লোকে বিস্মিত হয়ে ভাবল, এ কি সম্ভব? যে শহর চিরকালের

'ইটার্ন্যাল সিটি' নামে বন্দিত, একদা বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে বিরাজ করেছে, তার পতন কল্পনা করা যায় না। পরম খ্রীষ্টান সেণ্ট জেরোম পবিত্র তীর্থস্থানে বসে যখন খবর শুনলেন যে শেষ সম্রাট অগস্ট্‌লাস সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তখন তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত এই মহানগরীর পতন অবিশ্বাস্য। তাই লোকের ধারণা হয়েছিল যে রোম পড়ে গেলে সভ্যতাও লোপ পেল।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোমান সভ্যতার দান অর্থাৎ তার ভালো দিকগুলো লুপ্ত হয়ে যায় নি। রোমের বিখ্যাত আইন কানুন, শৃঙ্খলা প্রশাসন, পূর্ত বিভাগ, জলসেচের প্রণালী, রাজপথ ইমারৎ প্রভৃতি নির্মাণের কৌশল পরবর্তী কালে, ঐ 'অন্ধকার' যুগেও সমাদর পেয়েছে এবং য়ুরোপের নানা জায়গায় অনুকরণ করা হয়েছে। আগই বলেছি, রোমের পতনের পর য়ুরোপের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে যে সব ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে, সেখানে রোমান শাসন পদ্ধতির কিছু প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। রোমকে মডেল, বা আদর্শ রেখে ঐ রাজ্যগুলি সংবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে শেখে। এ সব অন্ধকার যুগের লক্ষণ নয়।

কিন্তু অন্ধকার যুগে সভ্যতার আলো ক্ষীণ হয়ে এলেও একেবারে যে নিভে যায়নি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, খ্রীষ্টধর্মের অস্তিত্ব লোপ পায়নি। বরং নানা নির্যাতন ও দমন সত্ত্বেও তা ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। যাঁরা সভ্যতার ক্ষীণ ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং ধর্মাধর্ম জ্ঞানের আলোক শিখাটিকে ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল করে তোলেন, তাঁদের বলা হয় 'The Early Fathers' অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের প্রথম সংগঠক ও প্রচারক। মঠগুলিতে নবজাত খ্রীষ্টধর্মকে এঁরাই অতি যত্নে লালন পালন করেন। রাজরোষ, শত্রুপক্ষের তাড়না, দৈহিক কষ্ট অপমান সব কিছু সহ্য করে তাঁরা পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর য়ুরোপে ধর্মপ্রচারের কাজ ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যান। এঁদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই খ্রীষ্টধর্ম টিকেছিল, রোম সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার নানা জায়গায় প্রসারিত হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র উপদেশগুলি এঁরাই লিপিবদ্ধ করেন, খ্রীষ্টধর্মের সারনীতি ব্যাখ্যা করে আগ্রহী ব্যক্তিদের দীক্ষা দেন। ফলে, সাধারণ নরনারীর কাছে এই পুণ্যজীবন ও সরল মানবিক ধর্মের আবেদন বাড়তে থাকে। যীশুখ্রীষ্টের বারোজন ভক্ত শিষ্যদের বলা হয় 'দ্বাদশ অ্যাপস্‌ল'। তাঁদের উপর ভার ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, দায়িত্ব ছিল জনসাধরণকে শিক্ষা ও দীক্ষা দান। জ্ঞানী ও ঋষিতুল্য পুরুষ বলে এঁদের 'সেণ্ট' আখ্যা দেওয়া হয়। যীশুর শিষ্যদের মধ্যে সেণ্ট জন, সেণ্ট পল, সেণ্ট লিউক ও সেণ্ট ম্যাথ্যুর সুপরিচিত। আর একজন ছিলেন সেণ্ট পিটার। স্বর্গের দরজার চাবি নাকি তাঁরই হাতে ছিল, এই রকম জনশ্রুতি আছে।

যীশুর শিষ্য-প্রশিষ্যরা 'চার্চ' অর্থাৎ সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে একটি সংঘবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে উদ্যোগী হন। তার বিধি-নিয়মগুলি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সংগঠনের মধ্যে যেন শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। পরে খ্রীষ্টান জগতে আরও কয়েকজন জ্ঞানী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যাঁদের উদ্যমে খৃষ্টান 'চার্চ' একটি দৃঢ় ও বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়। কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম জগতের এক বৃহত্তম ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। এর পেছনে কোন কোন রোম সম্রাট ও স্থানীয় রাজার আনুকূল্য ছিল। প্রথম দিকে

বিরোধিতা ও মতান্তর থাকলেও সপ্তম শতক থেকে 'দ্য চার্চ', মানে গির্জা নয়, সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান আর 'স্টেট' মানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান, পরস্পর সহযোগিতা করতে থাকে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে ও সংগঠন কাজে যাঁদের মহৎ দান ছিল ঐ 'অন্ধকার যুগে', তাঁদের মধ্যে সেণ্ট গ্রেগরি, সেণ্ট ব্যাসিল, সেণ্ট অ্যাম্‌ব্রোস এবং বিশেষ করে, সেণ্ট অগাস্টিনের নাম স্মরণীয়। অগাস্টিন খ্রীষ্টানদের কাছে এক মহাজ্ঞানী পুরুষ বলেই গণ্য। তাঁর লেখা দুখানি মূল্যবান বই 'কনফেশ্যন্‌স' (আত্মকথা) এবং 'সিটি অব গড' (দিব্য নগরী) তাঁর জীবন ও আদর্শ সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছে।

অতএব এই 'অন্ধকার' যুগের কোন ইতিহাস নেই, এ ধারণা ভুল। ইতিহাস আছে এবং আধুনিক পণ্ডিতরা সেই ইতিহাস খুঁজে খাড়া করেছেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক ও সংগঠকদের কাজ চিন্তা ও লেখার মধ্যেই ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল রোমান 'স্টেট' বা রাষ্ট্রের গৌরব গেছে বটে কিন্তু তার জায়গায় ঐ রোমকে কেন্দ্র করে পাথরের মতো শক্ত ভিত্তিতে গড়তে হবে সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের প্রাণকেন্দ্র। এবার সম্রাটের তৈরী শহর নয়, হবে ঈশ্বর-পুরী—দিব্য রাজধানী।

॥ অনুশীলনী ॥

১। য়ুরোপের ইতিহাসে কোন সময়-কালকে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়?

২। অন্ধকার যুগ বলা হয় কেন? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

৩। এই যুগ যে সত্যই অন্ধকার নয়, তার একটি বড় কারণ দেখাও।

৪। 'বর্বর' জাতিরা কি সত্যই অসভ্য ছিল? তাদের রোম আক্রমণের মূলে উদ্দেশ্য কি ছিল?

৫। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক ও সংগঠকরা কি কাজ করেছিলেন? তাঁদের সব চেয়ে বড় কাজ কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

১। 'ইটার্ন্যাল সিটি' কাকে বলে?

২। 'সিটি অব্ গড' শব্দটির মানে বল।

৩। সেণ্ট অগস্টিন কি কারণে বিখ্যাত? তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি ছিল?

৪। সংশোধন কর:

(ক) অষ্টম শতক থেকে অন্ধকার যুগের সূচনা;

(খ) যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত শিষ্য ছিলেন দশ জন;

(গ) 'দ্য চার্চ' মানে গির্জা;

(ঘ) সেণ্ট গ্রেগরি 'কনফেশ্যন্‌স' নামে আত্মকথা লেখেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত কন্স্ট্যাণ্টিনোপল শহরকে কেন্দ্র করে একদিন যে বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ইতিহাসে তাকেই **বাইজান্টাইন** সভ্যতা বলে। রোম বড় হবার বহু আগে এখানে বাইজান্টিয়ম্ নামে একটি গ্রীক উপনিবেশ ছিল। অনেক পরে ঐ জায়গায় বিখ্যাত রোমসম্রাট কন্স্ট্যান্টাইন নতুন রাজধানী স্থাপন করেন, নাম দেন, কন্স্ট্যাণ্টিনোপল অর্থাৎ কন্স্ট্যান্টাইনের নগর। নতুন নামকরণ হলেও প্রাচীন নামের স্মৃতি মুছল না। তাই মধ্য যুগের য়ুরোপের এই পূর্ব সাম্রাজ্যকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বলে পরিচয় দেওয়া হয়।

মধ্য যুগের সূচনায় ভূমধ্যসাগরে পূর্ব সীমায় দুটি বিশাল রাষ্ট্র ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়। ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানি প্রভৃতি দেশের ইতিহাস যখন ভাল করে সুরু হয় নি, তখনও এই অঞ্চলে দুটি নগর খুব বিখ্যাত ছিল। একটি কন্স্ট্যাণ্টিনোপল অপরটি বোগদাদ
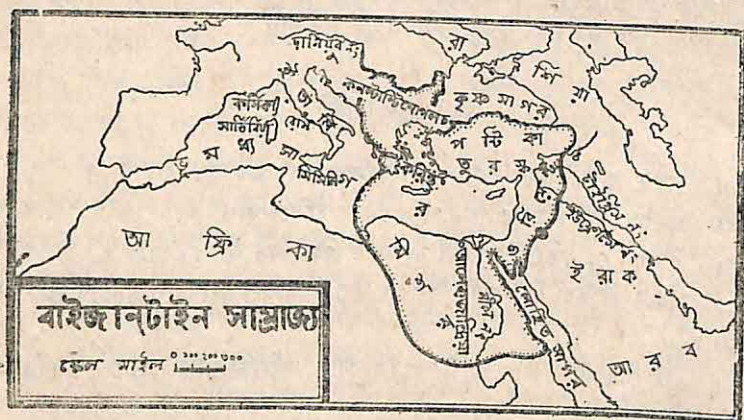
প্রথমটি আরও প্রাচীন, বাইজান্টাইন খৃষ্টান রাজধানী দ্বিতীয়টি আরব সাম্রাজ্যের ও মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ নগরী। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকেই আরবদের সাম্রাজ্য। পাশাপাশি এই দুটি অঞ্চলে এককালে শিল্প ও সভ্যতার আশ্চর্য উন্নতি হয়। এদের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

বাইজান্টিয়ম ও নতুন রাজধানী ঃ রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ 'বর্বর' দলের বারবার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে তার অস্তিত্ব রইল না। কিন্তু পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলি অনেক দিন টিকেছিল। বলকান উপদ্বীপ, এসিয়া মাইনরের সমৃদ্ধ স্থানগুলি, সিরিয়া এবং মিশর এই সব জায়গা নিয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য গঠিত। কন্স্ট্যাণ্টিনোপল শহরে বসে রোমান সম্রাটরা পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। খ্রীষ্টান সম্রাট কন্স্ট্যান্টাইন যখন পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য অধিকার করে নতুন রাজধানীর পত্তন করেন তখন উপযুক্ত জায়গাই বেছে নেন। কৃষ্ণসাগরের মুখের কাছে বস্ফরাস্ প্রণালীর

উপকূলে কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল তৈরি হল। সামনেই সমুদ্র, অপর পারে এসিয়া। বাণিজ্যের সুখসুবিধা প্রচুর। কালক্রমে এই শহর সেকালের একটি বৃহত্তম বন্দরে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়—শহরটি সুরক্ষিত, চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য-সাগরের সংযোগ স্থানে এসিয়া ও য়ুরোপের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত বলে পূর্ব-পশ্চিমের যত বাণিজ্য এইখানে এসে জমায়েত হত। কন্‌স্ট্যান্টাইন মনের মতো করে রাজধানী গড়েছিলেন। শ্বেত মর্মরে মণ্ডিত প্রাসাদ, স্নানাগার ও বিপণিতে সজ্জিত নগর অপূর্ব শোভা ধারণ করল। রোম থেকে ভাল ভাল পাথরের মূর্তি ও শিল্পকলার কাজ আনিয়ে নতুন রাজধানীর সৌন্দর্য্য বাড়ানো হল। শহরের মাঝখানে একটি মর্মর স্তম্ভে সগৌরবে লেখান হল, 'ইহাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল'; খ্রীষ্টধর্মে পরম ভক্তিমতী জননী হেলেনার একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল তাঁর নিজের মূর্তির পাশে। সম্রাট এই ভাবে যে নগর স্থাপন করে গেলেন, হাজার বছর ধরে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার গৌরব অম্লান ছিল। রোমকে তুচ্ছ করে কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল তৈরী করা হয়। পরে রোমান সাম্রাজ্য পড়ে গেলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য আপনার কীর্তি বজায় রেখেছিল।

সম্রাট জ্যাস্টিনিয়ন: খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জ্যাস্টিনিয়ন পূর্বসাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর মত বিজ্ঞ ও কৃতী পুরুষ সে যুগে কেউ ছিল না। তিনি সামান্য কৃষককূলে জন্মেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধি ও বাহুবলে পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি খুব শিক্ষিত ছিলেন। আইন ও রাজস্ব ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতা ছিল। তিনি দেখলেন, যেসব আইন প্রচলিত আছে তাতে অনেক গলদ। তাই ত্রুটি সংশোধন করে আইনগুলি তিনি সংকলিত আকারে একত্র প্রকাশ করেন। বিচারক ও আইনজ্ঞ ব্যক্তির মতামত ও সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ হল। এতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা হয়। রোমান আইন ও বিচার কি, তা বোঝাবার জন্য জ্যাস্টিনিয়ন বহু পরিশ্রম করেন এবং সেই জন্যই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বত্র একই আইনকানুন ও শাসন-শৃঙ্খলা চালু করে সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ করা।
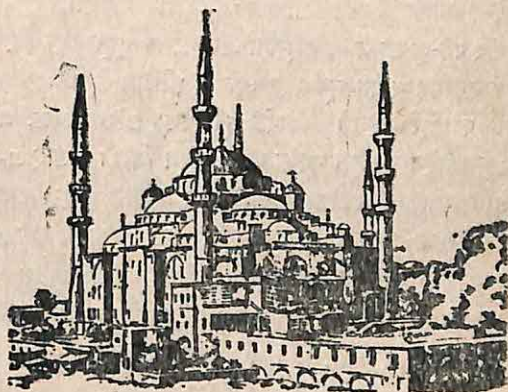
সেণ্ট সোফিয়া

সে কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। শুধু আইন নয়, ধর্ম সঙ্গীত ও শিল্পকলাতেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর দান অসামান্য বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ, সেতু ও স্নানাগার নির্মাণে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর রাজত্বকালে কনস্ট্যাণ্টি-

নোপল শহরে সেণ্ট সোফিয়া নামে বিশাল গির্জা তৈরী করা হয়। অপূর্ব সুন্দর তার কারুকার্য। ভিতরে প্রবেশপথে মস্ত উঁচু খিলান ও গম্বুজ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তুর্কী বিজয়ের পর এই গির্জা মসজিদে পরিণত হয়।

প্রজাদের সঙ্গে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করলেও সম্রাট খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁর গাম্ভীর্য দেখে লোকেরা তাকে ভারী সমীহ করত। একজন লেখক বলেছেন, জ্যাস্টি-নিয়নকে কেউ কখনও যুবক দেখে নি। তার সভাসদরা তাঁর অমানুষিক ধৈর্য ও পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে অবাক হতেন। কেউ কেউ বলতেন, তিনি অপদেবতা; তাঁর ঘুমের দরকার নেই। তাঁর পত্নী থিওডোরা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তার সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। জ্যাস্টিনিয়ন উত্তর আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি জায়গা আবার দখল করেন সত্য, কিন্তু এইসব যুদ্ধবিগ্রহে সম্রাটের অজস্র অর্থ ও শক্তি ব্যয় হয়। কন্স্ট্যাণ্টাইনের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে তাকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। ইটালিতে গথদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য তিনি বেলিসেরিয়স নামে এক বীর সেনাপতিকে নিযুক্ত করেন। বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেলিসেরিয়স র‍্যাভেনা নগর অধিকার করেন। এদিকে পারস্যের সঙ্গেও বহুদিন যুদ্ধ চলছিল, তাতে অর্থক্ষয় ছাড়া বিশেষ কোন ফল হয় নি।

সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি ঃ জ্যাস্টিনিয়নের পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আরও নয়শ' বছর টিকেছিল কিন্তু সাম্রাজ্যে শান্তি ছিল না, চারিদিক থেকে শত্রুর আক্রমণে ভাঙন ধরল। আরবদের সঙ্গে বহু দিন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে, আবার উত্তর দিক থেকে আভার ও শ্লাভ হানাদার দলও নেমে আসে। এদিকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে তুর্কীরা এসিয়া-মাইনর অধিকার করলে খ্রীষ্টান ও মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধল। 'ক্রুসেড' অর্থাৎ ধর্ম-যুদ্ধের সময় কন্স্ট্যাণ্টিনোপলের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। তবে শেষের দিকে সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান উপাসনার পদ্ধতি নিয়ে মতান্তর হওয়ার ফলে দুটি দল সৃষ্টি হল। একটি পূর্বদিকের গ্রীক ধর্মমত, অপরটি পশ্চিমের রোমান ধর্মমত। বাইজানটাইন সাম্রাজ্য পূর্বের মতই প্রবল ছিল। তাই এখান থেকে খ্রীষ্টান ধর্মের গ্রীক মতটি রাশিয়া ও য়ুরোপের পূর্ব অঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব আর ঘনঘন সম্রাটের বদল, এই সব কারণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন সুরু হয়।

বাইজান্টিয়মের ঐশ্বর্য ঃ কন্স্ট্যাণ্টাইন তাঁর রাজধানীকে যে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত করেন, তা অনেকদিন অক্ষুণ্ণ ছিল তিনি এর নাম দেন 'নতুন রোম'। এই নগরীর ঐশ্বর্য এবং রাজদরবারের শোভা আড়ম্বর গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। এখানে বহুমূল্য সিংহাহসন, সোনার রাজদণ্ড, সম্রাটের বেশভূষা, রাজপুরুষ ও সভাসদদের জমকালো পোশাক দেখলে চোখ ফেরানো যেত না। শহরে লোকারণ্য। কত দেশ থেকে লোকে এখানে বেড়াতে, গ্রীক শিক্ষা করতে, অথবা বাণিজ্য করতে আসত। প্রাচ্য দেশের শ্যামবর্ণ মানুষ পীতবর্ণ মোঙ্গলীয় মানুষ আবার য়ুরোপের শ্বেতকায় মানুষ পাশাপাশি ঘুরে বেড়াত। শহরে যেন নিত্যই মেলা বতস। কত ভিন্‌দেশী সার্কাস খেলোয়াড় ও বাজিকরের দল ভিড়

জমাত। প্রকাণ্ড বন্দর, প্রকাণ্ড বাজার। সেখানে সারা দুনিয়ার মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে বেচাকেনা চলত। ইথিওপিয়া, সিংহল ও ভারত থেকে লোহিত সমুদ্র পথে পণ্যদ্রব্য আনত সওদাগরের দল। এমন কি রাশিয়া ও সুদূর চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। শোনা যায়, চীন থেকে রেশমের গুটিপোকা লুকিয়ে এনে এ রাজ্যে রেশম-শিল্প প্রবর্তন করা হয়।

বাণিজ্যের জন্য জাহাজ তো ছিলই, যুদ্ধের জন্য রণতরীও ছিল অনেক। বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের সৈন্যবল ও নৌবাহিনী বিশেষ শক্তিশালী ছিল। বারুদের মত পদার্থ দিয়ে বিস্ফোরণ করার কৌশল তারা জানত। একেই 'গ্রীক ফায়ার' বলা হয়। এসিয়া-মাইনর

মোজেইক শিল্পের নমুনা :—জ্যাস্টিনয়ন ও সভাসদবৃন্দ

ও আর্মেনিয়া অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত। এক দিকে বিশাল সাম্রাজ্যে বিপুল শক্তি, অপর দিকে বাণিজ্যসম্ভার, এই নিয়ে বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য।

বাইজান্‌টিয়ম সে যুগে সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরও কেন্দ্র ছিল। তীর্থযাত্রী, শিক্ষার্থী ও শিল্পীর সম্মেলনে এই নগর একদিন ধন্য হয়েছিল। গ্রীক শিল্পীদের হাতের কাজ ছিল অতি চমৎকার। সোনা, রূপা ও মীনার কাজ তারা খুব ভাল ভাবে করতে পারত। সূতির কাপড়ে ফুল বা নকশার কাজ এত চিকন ও সুন্দর ছিল যে তার তুলনা হয় না। সৌখিন আসবাব তৈরি, হীরা জহরত কেটে পালিশ আর 'মোজাইক' পরিকল্পনা, এইসব বিষয়ে শিল্পী কারিগরদের আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল। শিল্পকাজের নমুনা দেখলেই বোঝা যায় যে, বাইজান্‌টাইন শিল্পীরা সরল সুন্দরের চেয়ে জটিল অলঙ্কারই বেশি পছন্দ করত। বাইজান্‌টাইন রাজ্যের দৌলতেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয়। কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের সভায় নানা শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা ও সমাদর ছিল। তা ছাড়া, ভারত ও আরব দেশের শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ও বাণিজ্যসম্ভার তারই মারফতে য়ুরোপে পৌঁছয়। কিন্তু তুর্কী অধিকারের পর এসিয়া ও

য়ুরোপের মধ্যে চলাচলের পথ পরহস্তে চলে যায়। তবু কন্স্ট্যাণ্টিনোপলের মর্যাদা ও গৌরব অ্যাথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়ার মতই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

অনুশীলনী

১। কন্স্ট্যাণ্টিনোপল' শহর কে প্রতিষ্ঠা করেন? এই শহরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। যে স্থানে কনস্ট্যাণ্টিনোপল স্থাপিত হয়, তার কি কি সুবিধা ছিল?

৩। জ্যাস্টিনিয়ন কিসের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত?

৪। বাইজ্যান্টাইন সভ্যতার অবনতি হয় কি কারণে?

৫। এই সভ্যতার প্রধান গৌরব কি?

৬। এখানকার রাজদরবারে যে জাঁকজমক ছিল, তাতে কোন দেশের প্রভাব ছিল মনে কর?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ

১। কন্স্ট্যাণ্টিনোপলের প্রসিদ্ধ গির্জার নাম কি?

২। কন্স্ট্যাণ্টাইন কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন?

৩। জ্যাস্টিনিয়ন আইন কানুন বিধিবদ্ধ করেন কি উদ্দেশ্যে?

৪। তুর্কীরা পশ্চিম এসিয়া জয় করার ফলে কি হইয়াছিল?

অশুদ্ধি সংশোধন করঃ

(ক) সেণ্ট সোফিয়া ছিল কনস্ট্যাণ্টিনোপলের একটি বিখ্যাত প্রাসাদ।

(খ) থিওডোরা ছিলেন সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের পত্নী।

(গ) বেলিসেরিয়স ছিলেন পারসিক সম্রাটের সেনাপতি।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের অভ্যুদয় ঃ প্রভাব

□ □

এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আরবদেশ একটি মরুময় উপদ্বীপ। এই দেশে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি মহান ধর্মমতের উদয় হয়, তার নাম ইসলাম। ইসলাম যখন সবে গড়ে উঠেছে, ভারতে তখন হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছেন। এই ধর্ম প্রচলন করেন আরবের এক মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের আগে আরব দেশের অবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। ঊষর মরুর দেশে কৃষির কাজ ভাল হত না, কারণ কয়েকটি মরু উদ্যান নিয়ে ছোট ছোট ছড়ানো শহর, আর বেশির ভাগ জায়গাই পাহাড় আর মরুভূমি। প্রাচীন সভ্যতার কাছে হলেও এ সময়ে আরব দেশে সে সভ্যতার কোন স্মৃতিই ছিল না। আরবে দুই শ্রেণীর মানুষ, কিছু সংখ্যক নগরবাসী আর বেশির ভাগ যাযাবর শ্রেণীর লোক। এরা বেদুইন, ঘোড়া বা উটের পিঠে সংসার বেঁধে বেড়াত। কিছু মালপত্র নিয়ে ব্যবসা, পশুপালন আর লুটপাট—এই ছিল এদের পেশা। এরা রুক্ষ ও হঠকারী হলেও খুব সরল ও অতিথি-বৎসল।

তবে আরবে পৌত্তলিকতা প্রভৃতি কয়েকটি কুসংস্কার ছিল। কলহ ও যুদ্ধপ্রিয় হলেও আরবরা নির্মম ও অসভ্য ছিল না। বরং কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাদের চরিত্রে কিছু মাধুর্য দিয়েছিল। আরব দেশে বড় শহর বলতে দুটি—মক্কা আর মদিনা। মক্কা তীর্থস্থান। এখানে 'কাব্য' অর্থাৎ এক খণ্ড কালো পাথর দেবালয়ে গাঁথা থাকত। এই পাথরই আরবীয়দের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু বলে গণ্য হত। তাদের নানা দেবতার মধ্যে আল্লাই ছিলেন প্রধান।

হজরত মহম্মদের জীবন ও বাণী ঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শহরে কোরেশ নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে হজরতের জন্ম হয়। শৈশবেই পিতৃহীন হওয়ায় দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে বড় হতে হয়। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শিখতে পারেননি, উট ও ভেড়া চরিয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হত। কিন্তু শিক্ষিত না হলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি ও স্বাভাবিক বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল। ক্রমে বয়স হলে রোজগারের চেষ্টায় তিনি খাদিজা নামে এক ধনবতী বিধবার কাছে কাজ নিলেন। মহম্মদের গুণে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা পরে তাঁকে বিবাহ করেন। কাজকর্ম করলেও মহম্মদের মনের গতি ছিল অন্য রকম। দেশের লোকের অন্ধ বিশ্বাস, কদাচার দেখে তাঁর মনে ঘৃণা হত। ক্রমে তাঁর ধর্মভাব প্রবল হয়ে ওঠে। একদিন তিনি বুঝলেন যে মূর্তিপূজা ভুল। ঈশ্বর এক, বহু নন। ঈশ্বরের আদেশে তাঁকে এই মত প্রচার করতে হবে। মহম্মদ এই সত্য উপলব্ধি করে যখন তা প্রচারে নামলেন, তখন খাদিজা আর দু চার জন ছাড়া আর কেউ তাঁর উপদেশ মানতে চাইল না, বরং বিদ্রূপ করতে লাগল। ক্রমে মক্কার লোক তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে

উঠল। বাধ্য হয়ে তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলেন। এই মদিনায় চলে আসা থেকেই মুসলমানরা **হিজিরা অব্দ** (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) গণনা করেন।
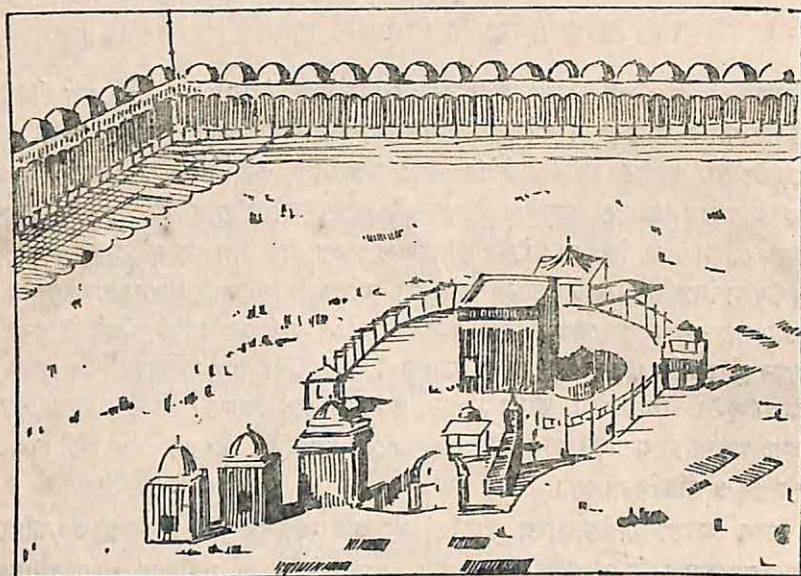
মক্কার পবিত্র পাথর—কাবা

মদিনাবাসীরা হজরতকে সাদরে গ্রহণ করল এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নিল। ক্রমশঃ তারা এত ভক্ত হয়ে উঠল যে এই ধর্মমত প্রচারের জন্য প্রাণ দিতেও রাজী হল। মক্কাবাসীরা তখন রাগে মদিনা আক্রমণ করল, মদিনাবাসীরাও আত্মরক্ষার জন্য তরোয়াল ধরল। বদরের যুদ্ধে মহম্মদের শত্রুরা হেরে গেল। এবার ইসলাম ধর্ম মক্কায় এবং মক্কা থেকে সমস্ত আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ল। হিজিরার পর হজরত আরও দশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর উক্তি ও উপদেশগুলি একত্র করে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়।

ইসলাম ধর্ম ও কোরান ঃ খ্রীষ্টানদের কাছে বাইবেলের মত মুসলমানদের কাছে তাদের ধর্মগ্রন্থ **কোরান শরিফ** অতি পবিত্র। ইসলামের সার কথা কোরানে পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে যে এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য নেই, আর মহম্মদই তাঁর নিজের প্রেরিত প্রকৃত দূত, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্ম প্রবর্তকরা মহৎ হলেও মহম্মদের চেয়ে কেউ বড় নন। এখন প্রত্যেক মানুষের কয়েকটি অবশ্য কর্তব্য আছে। সংযত ধর্মজীবন যাপন, একেশ্বরে বিশ্বাস, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, দীন-দুঃখীকে ভিক্ষাদান উপবাস ও ও প্রার্থনা করে দেহমনকে শুদ্ধ করা—এইগুলি ইসলামের সরল ও মূল নীতি। সকল মুসলমানই সমান, এক ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। এই সব অনুশাসনের ফলে রুক্ষ আরববাসীদের

চরিত্র ও নীতিজ্ঞান উন্নত হয়েছিল। মক্কা ও মদিনার অধিপতি হয়ে মহম্মদ আরবকে একটি রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করেন। ইরান ও ইস্তাম্বুলের রাজসভায় তিনি দূত পাঠান।

ইসলামের প্রসারঃ হজরত মহম্মদ যে শক্তি জাগিয়ে গেলেন, তা দিন দিন বাড়তে লাগল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরব জাতি একপ্রাণ হয়ে অন্যান্য দেশে 'সত্য ধর্ম' প্রচারে উদ্যোগী হল। যারা কোরান মানে না তারা অবিশ্বাসী। তাদের জয় করতে হলে সংঘবদ্ধ সামরিক শক্তির প্রয়োজন। এইভাবে মহম্মদের মৃত্যুর একশ' বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সব ধর্মে দীক্ষিত আরববাসীরা যেন নতুন উন্মাদনায় মেতে উঠল। ভারতের সিন্ধু প্রদেশ থেকে পশ্চিম য়ুরোপ পর্যন্ত তাদের জয়পতাকা উড়ল। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, মধ্য এসিয়ার অক্সাস নদী-অঞ্চল থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা, আবার উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের অনেক অংশ আরবী মুসলমানদের অধিকারে এল। বহু দেশে ইসলামের বাণী বহন করে ও রাজ্য স্থাপন করে আরব মুসলিমরা অনেক প্রাচীন ও সভ্য জাতির সংস্পর্শে এল। ফলে তারা আরও শিক্ষিত ও সুসভ্য হয়ে উঠল। আরব সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ উন্নতির যুগে আরব সংস্কৃতি সভ্যতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করল।

চার খলিফাঃ হজরত অপুত্রক ছিলেন। তাঁর দেহান্তের পর কয়েকজন 'খলিফা' বা পরিচালক নির্বাচন করা হয়। এই খলিফারা ছিলেন ধর্ম আন্দোলনের নায়ক, ইসলাম জগতের সর্বময় কর্তা। অনেকে চেয়েছিলেন মহম্মদের জামাতা আলীই খলিফা হন কিন্তু নির্বাচনে আবুবকর যোগ্যতম বিবেচিত হলেন। প্রথম চারজন খলিফা 'পুণ্যবান্ ধর্মগুরু' নামে খ্যাতিলাভ করেন। **আবুবকর** প্রবীণ পণ্ডিত ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল 'সিদ্দিক' বা সত্যবাদী। তাঁর মৃত্যুর পর **ওমর** খলিফার পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর চেষ্টাতেই ইসলাম পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সদাশয়, প্রজাদের মঙ্গলরত এই মহাত্মার প্রাণনাশ হয়েছিল গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে। ওমরের পরে আসেন **ওসমান**, ওসমানের মৃত্যু হলে হজরতের জামাতা **আলি** খলিফার পদ লাভ করেন। মহম্মদের অনুচরদের মধ্যে আলীই চতুর্থ ও শেষ খলিফা। ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ এই চার খলিফার কাহিনী মনে রেখো। আলীর দুই পুত্র, হাসান ও হোসেন। হাসান চক্রান্তে পড়ে প্রাণ হারালেন আর হোসেন শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতায় কারবালার যুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন। মহরম পর্বের সময় কারবালার শোককাহিনী নিয়ে হোসেনের স্মৃতিপূজা করা হয়। এই সময় থেকেই মুসলিম সমাজ দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়—শিয়া ও সুন্নি। ইরান দেশের মুসলমান ও আলীর ভক্তরা শিয়া, আর আরবী ও তুর্কী মুসলমানরা সুন্নি সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

হারুণ-অল-রশীদের বোগদাদঃ হজরত মহম্মদের বংশ লোপ পেলে উন্মিয় বংশের বারোজন 'খলিফা' হন। তারপর আব্বাসীয় বংশ খিলাফৎ অধিকার করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুণ-অল-রশীদ। সভ্য জগতে সকলেই তাঁর খ্যাতি ও

ইস্‌লামধর্মের বিস্তার ও আরব সাম্রাজ্য ——

স্কেল মাইল ০ ৩০০ ৬০০
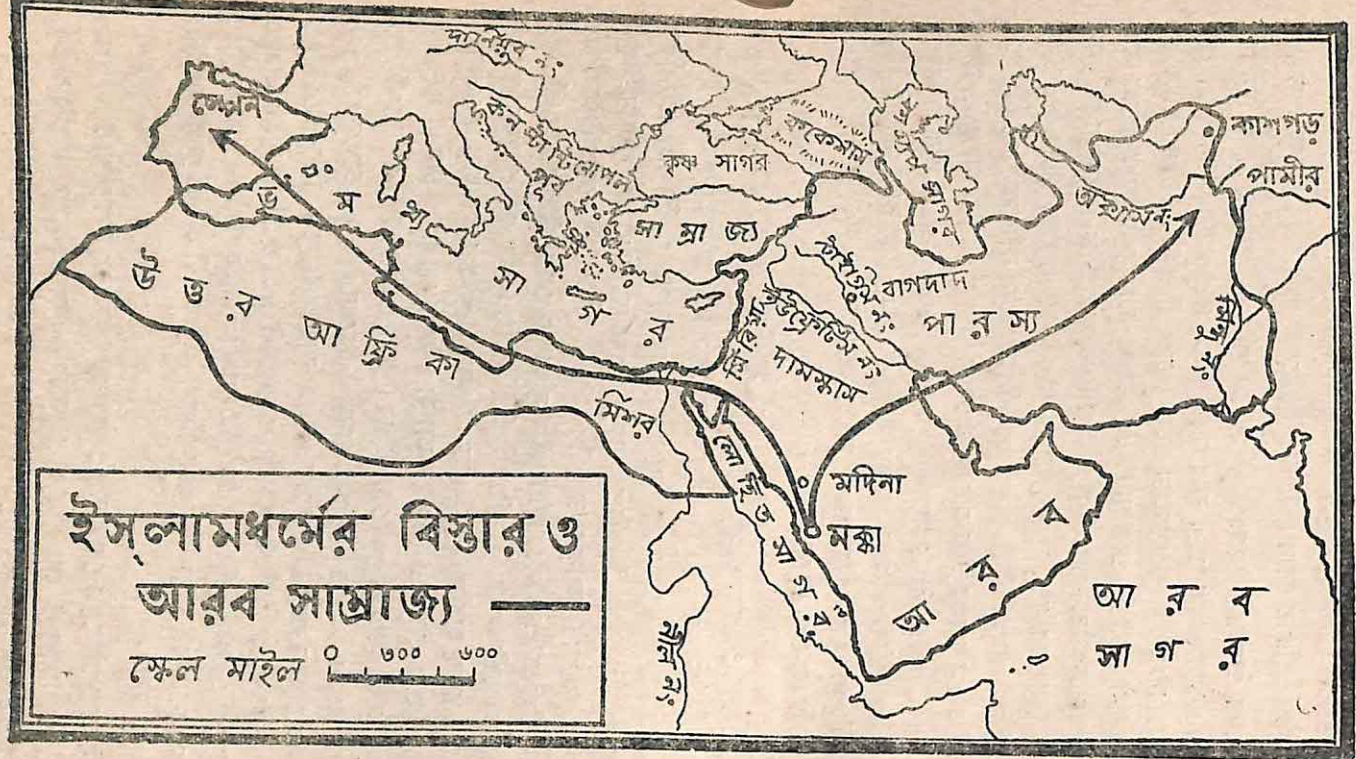
প্রতাপের কথা জানত। য়ুরোপ থেকে সম্রাট শার্লমান আর চীনের সম্রাট তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। ভারতে যেমন বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে অনেক গল্প আছে, হারুন-অল-রশীদও তেমনি অনেক সম্ভব অসম্ভব কাহিনীর নায়ক। সহস্র আরব রজনীর গল্প বা আরব্য উপন্যাস যে সময়কার কাহিনী, তখন হারুন-অল-রশীদ খলিফার তক্তে। এ সময়ে দুনিয়ার এক সেরা শহর ছিল বোগদাদ, বাইজান্টিয়মের প্রতিদ্বন্দ্বী। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, সাহিত্য ও শিল্পে বোগদাদের তখন জগৎজোড়া খ্যাতি। দামাস্কাস থেকে বোগদাদে রাজধানী সরিয়ে এনে খলিফারা শহরটিকে বিশাল রাজপ্রাসাদ এবং যাবতীয় বিলাস ও সৌন্দর্যের সামগ্রীতে সাজিয়েছিলেন। দরবারে দেশ-বিদেশের রাজদূত, উজীর-ওমরাহ হাজির থাকতেন। বড় বড় ইমারত, কাছেই সুদৃশ্য নদী টাইগ্রিস, প্রকাণ্ড বাজার আর বিভিন্ন দেশের পণ্য সম্ভার, সব মিলিয়ে বোগদাদ তখন প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ নগরী।

শিল্প ও ব্যবসায়ী, কবি ও গায়ক, যাদুকর ও নর্তকী, ধনী ও নির্ধন, পণ্ডিত ও মূর্খ সাধু ও প্রতারক—সকল মানুষই বোগদাদে ঘুরত। হাটে বাজারে বিচিত্র জিনিসের পসরা আর শিল্পকর্ম, পথে-ঘাটে নাচ-গান ও কৌতুক, এই সব নিয়ে রাজধানী ছিল যেন এক বিরাট প্রদর্শনী। শুধু তাই নয়. আব্বাসীয় আমলে বোগদাদই ছিল প্রাচ্য জগতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। বিদেশ থেকে জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য দলে দলে আসতেন শিক্ষার্থী। গ্রীক, ইহুদী ও ভারতীয় পণ্ডিতরাও এখানে সমবেত হতেন। গ্রীক ও হিন্দুদের নিকট থেকে এই সুযোগে আরববাসীরা জ্যোতিষবিজ্ঞান, জ্যামিতি ও বীজগণিত, চিকিৎসা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা প্রভৃতি শিখে নেয়। তারা নিজের চেষ্টাতেও অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের বিজ্ঞানমূলক রচনা এবং অনেক হিন্দুগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করতে থাকে। এই অনুবাদের কাজের জন্য তখনকার দিনে রীতিমত একটি সরকারী বিভাগ খোলা হয়।

এ যুগে **ইব্‌ন ইশাক্‌** নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। খলিফা অল-মামুন তাঁকে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সুযোগ্য শিক্ষিত পুত্রের সাহায্যে সারাজীবন পরিশ্রম করে তিনি গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটলের বই এবং অন্যান্য অনেক বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ গ্রীক ভাষা থেকে তর্জমা করেন। খলিফা খুশী হয়ে যত বই ইশাক্‌ অনুবাদ করেন তার ওজনমত সোনা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

স্পেনে মূর রাজত্বঃ অষ্টম শতকের প্রথম দিকে ভিসিগথদের রাজাকে হারিয়ে আরবরা স্পেন দেশের অধিকাংশ অধিকার করে। উত্তর আফ্রিকার উপকূল-অঞ্চল তারা ইতিমধ্যে দখল করেছিল। এখন দেশ-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব, সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা থেকে দলে দলে মুসলমান এসে এখানে বসতি করতে লাগল। স্পেনের আরবরা 'মূর' নামে ইতিহাসে পরিচিত। স্পেনে যে জায়গায় তারা প্রথম নেমেছিল, তা এখন জিব্রাণ্টার। মূর সেনাপতি জেব্‌ অল তারিখের নাম থেকেই জিব্রাণ্টার কথার উৎপত্তি। অল্পকালের মধ্যেই স্পেনের সেভিল, কর্ডোভা ও টোলেডো ও গ্রানাডা প্রভৃতি প্রদেশে ইসলাম ধর্ম, ভাষা ও রীতিনীতির প্রচলন হল। মূরদের শাসনকালে স্পেনে

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব বিকাশ দেখা যায়। এদেশের নতুন নতুন মসজিদ, গোলগম্বুজ ও মিনার দেওয়া সুরম্য প্রাসাদ ও অট্টালিকা আরব শিল্পকলার অভিনব চিহ্ন। কর্ডোভার মসজিদে গাছের পাতার মত বিচিত্র জালি ও নকশার কাজ আছে। এই ধরনের অলঙ্কার বা শিল্পের পরিকল্পনাকে **আরাবেস্ক্** বলা হয়। গ্রানাডার সুলতানদের

আরাবেসক্
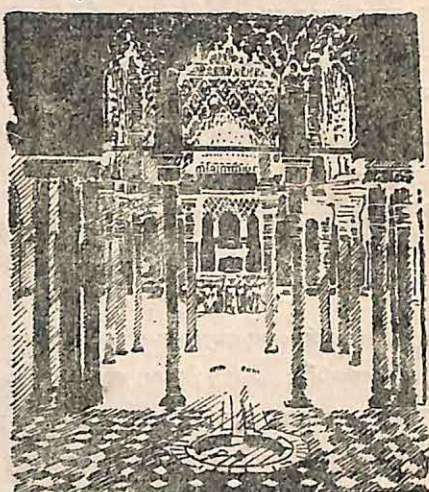
আলহামরা প্রাসাদের অভ্যন্তর

রাজপ্রাসাদ কারুকার্যে ও গঠনের সৌন্দর্যে বিশ্ববিখ্যাত। এই **আলহামরা** প্রাসাদের যে চত্বর আছে, তার স্তম্ভ ও খিলানগুলি আশ্চর্য সুন্দর মুররা যে ধাঁচে ইমারত তৈরি করত, সেই বিশিষ্ট ধরনটি পরবর্তী যুগে শিল্পীরা গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারেও মুররা যথেষ্ট সাহায্য করে। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় আর সরকারী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা থেকেই তাদের শিক্ষানুরাগ বোঝা যায়।

পৃথিবীর সভ্যতায় আরবের স্থান ঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর একশো বছরের মধ্যে মুসলমানরা যে বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তার কথা বলা হয়েছে। য়ুরোপে স্পেন অধিকার করে তারা পিরেনিস্ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সেও ঢুকেছিল। ফ্রাঙ্কদের রাজা **চার্লস্ মার্টেল** যদি এই সময়ে তাদের বাধা দিয়ে যুদ্ধে না হারাতেন, তা হলে তারা হয়ত ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশও জয় করে নিত। মধ্য যুগের আরম্ভকালে যেন এক হাতে কোরান অপর হাতে তরবারি নিয়ে তারা আরবদেশ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সামরিক শক্তি ও ধর্মের শিক্ষার জন্য এত বড় সাম্রাজ্য ও সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। আরবরা মধ্য প্রাচ্য দেশের লোক। তাই ভারতীয় ও চীন, দুটি সভ্যতার ধারাই আরবদেশ গ্রহণ করে কাজে লাগায়। এ জন্য আরবীয় সভ্যতাকে **মিশ্রসভ্যতা** বলে। খ্রীষ্টান য়ুরোপ ও ইসলামের মধ্যে দীর্ঘকালের শত্রুতা ও সংঘর্ষ থাকলেও, য়ুরোপ আরবদের কাছে থেকে অনেক শিখেছে ও নিয়েছে। সত্যই পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের আরবদের দান প্রচুর।

কাব্য-সাহিত্য, শিল্পকলা, গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আকাশতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র আর ইতিহাস রচনায় তাদের কৃতিত্ব বিস্ময়কর।

আরবের পাণ্ডিত্য ঃ এই প্রসঙ্গে কয়েকজন বিখ্যাত আরবীয় পণ্ডিতের কথা জানা দরকার। এঁদের মধ্যে **আবুসিনা** ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি বোখারার সুলতানের গ্রন্থাগারের সব বই পড়ে ফেলেন। তারপর তিনি নানা বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন যেমন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র। আবুসিনা ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, জ্ঞানের খনি বললেই চলে। **অল্-তবারি** ছিলেন আর এক পণ্ডিত। কোরানের উপর টীকা আর পৃথিবীর ইতিহাস লিখে তিনি আরব জগতে বিখ্যাত। সাল তারিখ অনুসারে ঘটনা সাজিয়ে তিনিই আরবী ভাষায় প্রথম ইতিহাস রচনা করেন। **ইবন্ খলদুনও** আর একজন নামকরা ঐতিহাসিক। উত্তর আফ্রিকার টিউনিস শহরে তাঁর জন্ম। গ্রানাডা ও মিশরে তিনি স্থানীয় সুলতানের অধীনে কাজ করতেন। যে গ্রন্থ রচনা করে খলদুন বিশ্ব-বিখ্যাত, তার নাম **'মকদ্দমা'**। এ এক বিরাট ইতিহাস—আরব, পারস্য ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাহিনী। সমালোচকরা বলেন, খলদুনের দৃষ্টি ছিল আধুনিক। একটি দেশের জলবায়ু, ভূগোল, সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার—সব কিছুই ইতিহাসের অঙ্গ বা বিষয়। খলদুন সেই মতই ইতিহাস রচনা করেন।

ইবন্ রুশদ ছিলেন আর এক মস্ত পণ্ডিত, একাধারে চিকিৎসক ও দার্শনিক। অ্যারিস্টট্লের রচনার উপর তাঁর অনেক টীকা আছে, আবার নিজের লেখা দর্শনশাস্ত্রের উপর বিখ্যাত গ্রন্থও আছে। এবার অন্য এক মনীষীর কথা বলা হচ্ছে যাঁর সঙ্গে ভারতের এক সম্পর্ক আছে। মহাপণ্ডিত **অল্ বিরুনির** নাম বিশ্ববিখ্যাত। সুলতান মামুদের রাজত্বকালে তিনি গজনীতে আসেন এবং মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ে পাঞ্জাবে এসে কিছুকাল বাস করেছিলেন। 'অল্‌বিরুনির ভারত' নামে তিনি এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করে যান। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর এমন নিখুঁত তথ্যপূর্ণ বই কোন বিদেশীই লিখতে পারেন নি। হিন্দুদের সমাজ, ধর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর দৃষ্টি ও জ্ঞান ছিল। মরক্কোবাসী **ইবন্‌বতুতা** দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময় ভারতবর্ষে আসেন ও সুলতানের অধীনে কাজীর পদ লাভ করেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনিও 'সফর নামা' বলে একখানা গ্রন্থ লেখেন। এই বই থেকে তুঘলক আমলে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। পরে এই দুইটি বইয়ের কথা আবার যথাস্থানে বলা হবে।

আরবের দান ঃ এখন দেখা গেল, সামান্য সূচনা থেকে আরবরা কত বড় শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয় এবং নানা বিষয়ে কত নতুন সৃষ্টি করে যায়। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলেও বোঝা যাবে, উম্মিয় ও আব্বাসীয় বংশের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা কিছু কম ছিল না। আরবদেরও গৌরব করবার মত নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি ছিল।

মসজিদ নির্মাণে তারা অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছে। যাকে ওমরের মসজিদ বলা হয়, সেই 'ডোম অব দ্য রক্' নামে সুদৃশ্য মসজিদ জেরুসালেমের নিকট এখনও বর্তমান। মহম্মদ স্বর্গযাত্রার সময়ে এখানে নাকি বিশ্রাম করেন, এই জনশ্রুতির ফলে স্থানটি পরম পবিত্র বলে গণ্য হয়। সেই পুণ্যস্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্য আরব শিল্পীরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে অতি সুন্দর গম্বুজ আর 'মোজেইক' দিয়ে এই বিখ্যাত মসজিদ্ তৈরী করে। শিক্ষার ব্যাপারেও আরবরা যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। 'ইরাকের মুকুট' বোগদাদ ছিল বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র। **কর্ডোভার** বিশ্ববিদ্যালয় আর কায়রোর সুপ্রসিদ্ধ **অল্ অজ্‌হার** বিদ্যাপীঠ আরব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আর এক বিষয়ে আরবদের কৃতিত্ব মানতে হবে। তারা ছিল সে যুগের সভ্যতার বাহক। চীন থেকে কাগজ তৈরি করা শিখে আরবরা সে বিদ্যা য়ুরোপকে শেখায়। বীজগণিত, আকাশতত্ত্ব এবং ১ থেকে ৯ পর্যন্ত আর শূন্য দিয়ে সংখ্যা লেখার পদ্ধতি ভারতীয় বিদ্যা। আরবরা তা গ্রহণ করে ও পরে য়ুরোপে প্রবর্তন করে। সংস্কৃতের 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের গল্পগুলিও এইভাবে আরব ভাষার মাধ্যমে য়ুরোপে পৌঁছায়। মুকাফা নামে এক সাহিত্যিক এই সংস্কৃত আখ্যান অনুবাদ করেন। শুধু সংস্কৃত নয়, অনেক মূল্যবান বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থ আরব পণ্ডিতরা অনুবাদ করেছিলেন বলে সেগুলি আজও রক্ষিত আছে। বাণিজ্যেও আরবরা পিছিয়ে ছিল না। ফিনিসীয়দের পরেই আরবরা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের সুদক্ষ নাবিক। দক্ষিণ ভারতের বন্দর থেকে হিন্দুরাই এককালে মসলাপাতির ব্যবসা করে বেড়াত। আরবরা যখন ব্যবসার ক্ষেত্রে নামল, তখন তারাই একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নিল। এক প্রান্তে চীন, অপর প্রান্তে স্পেন। মাঝখানে চার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আরবরা সওদাগরি করে বেড়াত এবং নানা সভ্যতা আর রীতি-নীতি দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত। আরবরা এককালে যে যাযাবর জাতি এবং ভ্রমণপ্রিয় ছিল, তা সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়লেই বোঝা যায়।

॥ অনুশীলনী ॥

১। মহম্মদের আগে আরববাসীরা কি রকম জীবন যাপন করত?
২। মক্কা ও মদিনা কোথায় ও কি জন্য বিখ্যাত?
৩। 'কোরান কি? তাহাতে কি কি উপদেশ আছে?
৪। ইসলামের প্রসার কোন কোন অঞ্চলে হয়, তা উল্লেখ্য কর।
৫। 'খলিফা' শব্দটির অর্থ কি? চারজন খলিফার নাম বল।
৬। হারুণ-অল-রশীদ কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জেনেছ?

৭। আরব সভ্যতা য়ুরোপের কোন অঞ্চলে পৌছায়? সেখানকার ছুটি বিখ্যাত জায়গার নাম কর।

৮। অল বিরুণি ও ইব্‌ন বতুতা কোন সময়ে ভারতে আসেন? তাঁদের বিবরণ থেকে কি জানা যায়?

৯। সভ্যতার ইতিহাসে আরবদের বিশিষ্ট দানগুলি উল্লেখ কর।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ

১। হিজিরা কাকে বলে?

২। কার্ডোভা, আলহামরা, অল- অজহার, এগুলি কি? কি জন্য বিখ্যাত?

৩। ইব্‌ন খলদুন কি বই লিখে গেছেন?

৪। কারবালায় কি হয়েছিল?

৫। আরবরা কাদের কাছ থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্য দখল করে নেয়? সেটা কিসের ব্যবসা ছিল?

৬। 'ডোম অব্‌ দ্য রক' সম্বন্ধে কি জনশ্রুতি? এটি কি ও কোথায়?

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্য যুগের পশ্চিম য়ুরোপ

(আঃ ৮০০ ১২০০ খ্রীঃ)
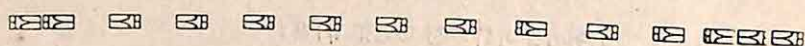
শার্লমানকে বলা হয় য়ুরোপের হারুন-অল-রশীদ। উভয়ে একই সময়ে রাজত্ব করতেন। বোগদাদের খলিফাকে নিয়ে যেমন নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, শার্লমানের চরিত্র ও কীর্তিকলাপ নিয়েও তেমনি অনেক গল্প গড়ে উঠেছে। কোন বড় রাজা বা নেতার মহত্ত্ব ও বীরত্ব মানুষের কল্পনাকে নাড়া দেয়। চারণ কবি ও গল্পকারেরা সেই মহত্ত্বের আদর্শ খাড়া করে মধ্য যুগে সাহিত্য সঙ্গীত রচনা করেছেন। তবে শার্লমান ঐতিহাসিক লোক, রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন বলে তাঁর প্রসিদ্ধি।

রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে 'ফ্রাঙ্ক' নামে এক গোষ্ঠী টিউটন শাখার মতই রাইন নদীর অঞ্চলে এক রাজত্ব স্থাপন করে ও খ্রীষ্টান হয়। বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানির কিছু অংশ নিয়ে এই রাজত্ব। এখানে মেরোভিঞ্জিয়ন নামে এক রাজবংশ ছিল। রাজারা দুর্বল হয়ে গেলে পিপিন নামে এক রাজ-কর্মচারী সিংহাসন অধিকার করলেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র চার্লস, পরে তিনি সম্রাট হলে তাঁকে 'চার্লস্ দি গ্রেট' বলা হত। 'শার্লমান' ঐ কথারই ফরাসী রূপ। তাঁকে নিয়ে যে সব গল্প ও গাথা রচিত হয় তা ফরাসী সাহিত্যে আজও বর্তমান। আসলে কিন্তু চার্লস জার্মন ফ্রাঙ্ক। চার্লসের এক বিশ্বস্ত সঙ্গী ও জীবনী-লেখক ছিলেন, নাম এগিনহার্ড। তাঁর লেখা জীবনচরিত থেকে সম্রাটের চরিত্র ব্যক্তিত্ব দৈহিক শক্তি প্রভৃতি অনেক কথা জানা যায়।

সাম্রাজ্য শাসন ও খ্রীষ্ট ধর্মের পালন ঃ শার্লমানের বংশকে **ক্যারোলিঞ্জিয়ন** বলা হয়। পশ্চিম ও মধ্য য়ুরোপে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন শার্লমানেরই কীর্তি। বিয়াল্লিশ বছর রাজত্ব কালের মধ্যে তিনি পঞ্চাশ বারেরও বেশী যুদ্ধ অভিযান এবং বিজিত অঞ্চলগুলিতে দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বর্তমান ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি এবং ইটালির অধিকাংশ জুড়ে বিস্তৃত। শার্লমানের উদ্দেশ্য ছিল, খ্রীষ্টান রাজ্য রক্ষা করা আর দুর্দান্ত স্যাক্সনদের জয় করে খ্রীষ্টান ও সুসভ্য করে তোলা। শেষোক্ত কাজটি সম্পন্ন করতে তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর সময় লেগেছিল। স্যাক্সনরা কিছুতেই বশ মানত না। শার্লমান উত্ত্যক্ত হয়ে তাদের কঠোর ভাবে দমন করেন। শেষ পর্যন্ত স্যাক্সন নেতা উইটকিণ্ড সদলবলে খ্রীষ্টান হয় ও সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। পূর্ব য়ুরোপের অনেক উপজাতিকে শার্লমান এইভাবে জোর করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। রাজ্যের কিনারায় স্যাক্সন বসতির নিকটে দুর্গ নির্মাণ করে সীমান্তরক্ষী কর্মচারীর সাহায্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা

স্থাপন করেন। একাধিক গির্জা ও মঠ স্থাপন করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারক পাঠিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারেও প্রভূত সাহায্য করেন।

৮১৪ খৃষ্টাব্দে ক্যারোলিঞ্জিয়ান, বাইজানটাইন ও খলিফা সাম্রাজ্য
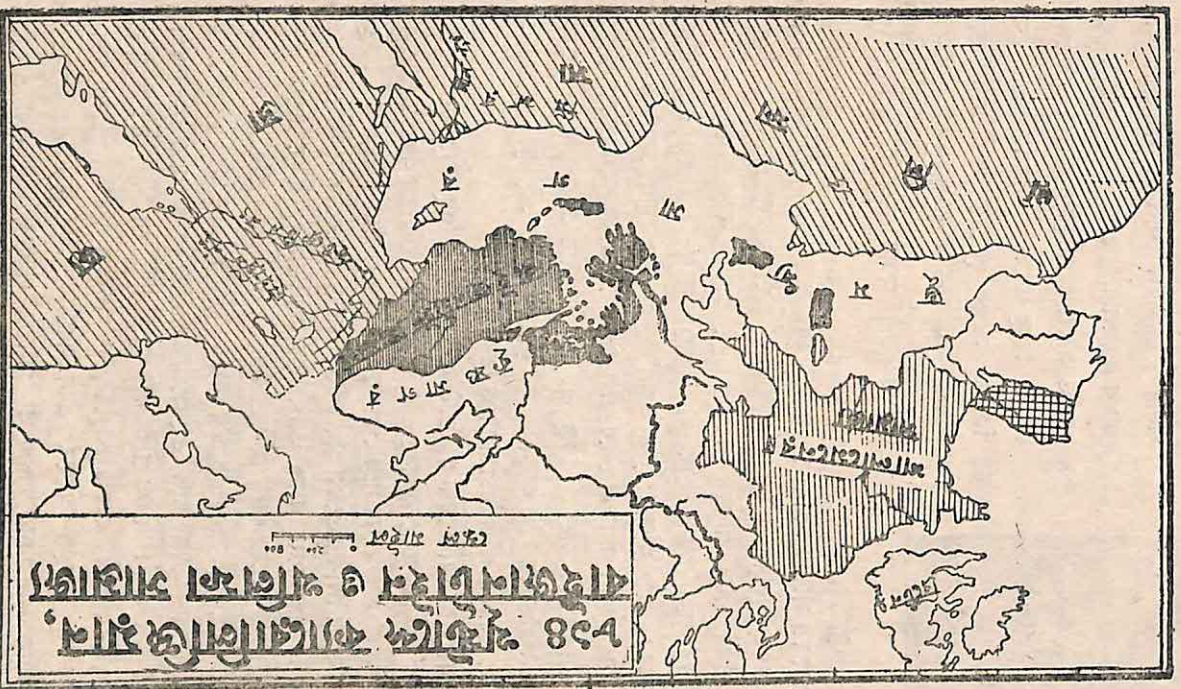
শার্লমান অনেক জায়গায় পথঘাট তৈরী করান ও জলাভূমি পরিষ্কার করে জঙ্গল কাটিয়ে অনেক জমি উদ্ধার করেন যাতে কৃষির উন্নতি হয়। আরব বাণিজ্যের সুবিধার

জন্য রাইন থেকে দানিয়ুব নদী পর্যন্ত প্রকাণ্ড খাল কাটাবার ব্যবস্থাও করেন। অবশ্য কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখো শাসন কাজে দক্ষ শার্লমান সাম্রাজ্যকে অনেকগুলি প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করে কাউন্ট, ভাইকাউন্ট প্রভৃতি অভিজাত ব্যক্তিদের হাতে সেগুলির শাসনভার দেন। কিন্তু তাদের খবরদারি করার জন্য আবার 'মিসি' নামে দূতদের পাঠাতেন। তারা এসে রিপোর্ট পেশ করলে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। তারপর একটি সভায় রাজাজ্ঞা ও নির্দেশগুলি পাশ করা হত।

শার্লমান

রোলাঁর সঙ্গীত কাব্য ঃ মুসলমানদের সঙ্গে শার্লমানের একবার সংঘর্ষ বাধে। স্পেনে তখন মূরদের রাজত্ব। শার্লমান কর্ডোভার সুলতানকে আক্রমণ করবার জন্য পিরেনিস পর্বত অতিক্রম করেন। দুই চারটি নগর দখল করার পর তাঁকে বাধা পেয়ে ফিরতে হয়। পথিমধ্যে পাহাড়ী স্যাক্সনরা পিছন থেকে তাঁর সৈন্যদল আক্রমণ করে। এই অসমান যুদ্ধে শার্লমানের বীর যোদ্ধা রোলাঁ ও তাঁর পরম বন্ধু অলিভার নিহত হন। শার্লমান শেষে প্রতিশোধ নিয়ে অনেক কষ্টে দেশে ফিরে আসেন। এইটুকুই ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এই ঘটনাটি নিয়ে একাদশ শতাব্দীর ফরাসী চারণ কবিরা এক সঙ্গীতকাব্য সৃষ্টি করেন। মধ্য যুগের সাহিত্যে এই মধুর বীরগাথা এক অপূর্ব সুন্দর রচনা, এর নাম শাঁজ দ্য রোলাঁ বা রোলাঁর গান।

শার্লমানের অভিষেক ঃ খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু ছিলেন পোপ, রোমে তাঁর অধিষ্ঠান। সেকালে য়ুরোপের সমস্ত রাজা ও সামন্তদল পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভেবে মান্য করতেন। শার্লমানের সঙ্গে পোপের নানা কারণে বনিবনা ছিল না। কিন্তু একদিন পোপ শার্লমানের শিবিরে এসে সাহায্য চাইলেন, লম্বার্ড শত্রুদের দমন করবার জন্য ইটালিতে যেতে হবে। শার্লমানের বীরত্ব ও খ্যাতির কথা তিনি পূর্বেই শুনেছিলেন। শার্লমান লম্বার্ডদের হারিয়ে রোমের শান্তি ফিরিয়ে আনলেন ও পোপকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কৃতজ্ঞ রোমানরা তাঁকে 'পেট্রিশিয়ান' ও চার্চের রক্ষক' বলে অভ্যর্থনা করল। পোপের ভয় দূর হল, কিন্তু ইটালির অনেক অংশ এই সুযোগে শার্লমানের অধিকারে এসে গেল। এবার এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের দিন পোপ সেণ্ট পিটারের গির্জায় উপাসনা শেষ করলেন। বেদীর অদূরে ইষৎ অন্ধকারে শার্লমান পুত্রদের নিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে নতজানু অবস্থায় আছেন, এমন সময়ে পোপ মুকুট হাতে অগ্রসর হলেন ও স্বপক্ষের সহায় শার্লমানের মাথায় তা পরিয়ে দিলেন। এই অভাবিত দৃশ্যে গির্জার ভিতর চমকিত জনতা শার্লমানকে সম্রাট ও ধর্মরক্ষক বলে অভিনন্দন জানাল। সেদিন থেকে 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' সৃষ্টি হল, কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে পূর্ব সাম্রাজ্যের মর্যাদা

কমতে থাকল। ঘটনাটি নাটকীয় দৃশ্যের মত হলেও আসলে এটি রোমান সাম্রাজ্য হয়ে ওঠেনি। আয়তনে নয়, জাতীয় চরিত্রেও নয়। একে বৃহৎ জার্মন রাজ্য ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আর 'পবিত্র' কিসে? অভিষেক ব্যাপারটি আকস্মিক, নয়তো পূর্বকল্পিত বলে অনেকে সন্দেহ করেন। পোপের মুকুট দানের ক্ষমতারও কোন নজির ছিল না। ঐতিহাসিকরা তবু মনে করেন, ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লমানের অভিষেক একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এখন থেকে মধ্যযুগের আরম্ভ, খ্রীষ্টধর্মের সংঘবদ্ধ প্রসার, জ্ঞান ও শিল্প-কলার নতুন বিকাশ এবং পোপ ও সম্রাটের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সুরু। মোট কথা, এই অভিষেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল দেখে পণ্ডিতরা বলেন, য়ুরোপের ইতিহাসে একটা বড় পরিবর্তনের সূচনা হল।

শার্লমানের কীর্তি ঃ কিন্তু মনেপ্রাণে ফ্রাঙ্ক হলেও রোম **অগস্টাসের** মত খ্যাতিমান সম্রাট হবার মোহ শার্লমানের ছিল। রাইন নদীর তীরে নিজ রাজ্যে তিনি **অ্যাকেন** নগরে রাজধানী বসালেন। বড় বড় শিল্পী ও কারিগর আনিয়ে গির্জা তৈরী করালেন। র‍্যাভেনা থেকে 'মোজেক' আনিয়ে প্রাসাদ সুসজ্জিত করলেন। রাজ্যের নানা জায়গায় বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠল। শার্লমান নিজে শিক্ষিত না হলেও জ্ঞানের কদর করতেন। তাই য়ুরোপের নানা স্থান থেকে পণ্ডিত ও লেখক আনিয়া রাজসভা অলঙ্কৃত করলেন। গৃহহীন ইংরেজ সাধু পণ্ডিত **আলকুইন** এসে তাঁর রাজসভায় বাস করতে লাগলেন। তাঁরই চেষ্টায় রাজপ্রাসাদে বিদ্যালয় বসল। সেখানে সাধারণ ঘরের ছেলেরাও পড়তে পেত। শার্লমান খুব পরিশ্রমী ছিলেন, বিদ্যাচর্চায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। খেতে বসেও তিনি ইতিহাস পড়া শুনতে চাইতেন। ল্যাটিন ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল, গ্রীক ভাষাও তিনি বুঝতে পারতেন। **এগিনহার্ড** আর **আলকুইন** তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। এইরূপে তাঁর খ্যাতি সভ্য জগতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যায় বোগদাদ থেকে হারুন-অল-রশীদ তাঁকে একটি হাতি ও আশ্চর্য জলঘড়ি উপহার পাঠান।

শার্লমান যে রোমান সাম্র্যজ্যের পুনর্গঠন করলেন, তার ফল হল এই যে বহুদিন ধরে সম্রাট ও পোপের মধ্যে কলহ ও শক্তি-পরীক্ষা চলতে লাগল। জার্মন রাজারা রোমের সম্রাট বলে নিজেদের জাহির করতেন। আর পোপ চাইতেন, সম্রাট সুদ্ধ খ্রীষ্টান জগৎ তাঁর কাছে মাথা নীচু করুক। ফল যাই হোক, শার্লমান যে সত্যই এক আশ্চর্য কৃতী পুরুষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সম্রাট বা শাসক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি নয়। খ্রীষ্টধর্ম, বিদ্যা ও শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষক রূপেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। তাই কেবল ইতিহাসে নয় সাহিত্যেও তাঁর কাহিনী আসন পেয়েছে।

পোপের শাসন ঃ পোপ-সম্রাট দ্বন্দ্ব ঃ শার্লমানের অভিষেক প্রসঙ্গে পোপের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কের কথা বলছি। শার্লমানের সাহায্য ছাড়া পোপ লম্বার্ড শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। শার্লমান পোপের সঙ্গে মৌখিক সৌজন্য রেখে চলতেন। তবে আপনার রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় তিনি খুশি মতো বিশপ ও অন্যান্য ধর্মযাজকদের নিযুক্ত করতেন, পোপের এক্তিয়ার মানতেন না। সুতরাং 'পবিত্র রোমান

সাম্রাজ্যে' গোড়ার দিকে সম্রাট ও পোপের মধ্যে প্রকাশ্য কলহ সুরু হয় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর আপস ও সহযোগিতা চলছিল। কিন্তু এগারো শতকের শেষ দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করল।

এই দ্বন্দ্বের মূলসূত্র বা কারণগুলি আগে বুঝে নেওয়া দরকার। একদিকে সম্রাটের দাবি তিনি পোপের অধীন নন, বরং পোপই তাঁর বশ্য। যেহেতু সম্রাটই পোপকে তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, তাঁর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রেখেছেন। আর পোপের দাবি যে সম্রাটই তার বশ্য। যেহেতু সম্রাটকে তিনিই মুকুট দান করে 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য' অধিষ্ঠিত করেছেন। দুপক্ষই অনেক সময়ে জেদ ও রেষারেষি করে বিবাদ ঘনিয়ে তুলেছেন। ফলে, 'এম্পায়ার' বা সম্রাটের শাসনতন্ত্র, আর 'পেপ্যাসি, অর্থাৎ পোপ তন্ত্র—এক কথায় সম্রাট ও পোপের পদাধিকার ক্ষমতা, এক্তিয়ার প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় এবং সেই সংঘর্ষ প্রায় দুশো বছর চলেছিল।

মধ্য যুগে মানুষের মনে ধর্মভাব ছিল প্রবল। ধর্মের অনুমোদন নিয়েই সব কাজ গ্রাহ্য হত। সম্রাটের যে রাষ্ট্র, তারও ভিত্তি ধর্মের উপর। এই ধর্মকে রোমান ক্যাথলিক' বলা হয়, কারণ এর পীঠস্থান হল রোম এবং তার প্রকৃতি ক্যাথলিক অর্থাৎ উদার ও সর্বব্যাপী। শার্লমান ছিলেন ঐ ধর্মরাষ্ট্রের অধীশ্বর। অতএব পোপের রাজ্য ও ক্ষমতা তারই মধ্যে, তার বাইরে নয়। পোপ ধর্মগুরু হলেও রোমান বিশপ, তার বেশি নয়। তাঁর আলাদা সাম্রাজ্য নেই, তাঁর প্রভুত্বও সার্বভৌম নয়। বরং রক্ষাকর্তা ও পৃষ্ঠপোষক সম্রাটের নীচে তিনি এক বড় সামন্ত বিশেষ। দুই পক্ষের বিরুদ্ধে দাবিই হল ঝগড়ার মূল কারণ। তার সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্ন জড়িয়ে থাকায় সমস্যা জটিল হয়ে উঠে। মীমাংসা হয় অনেক পরে। সাম্রাজ্য পড়ে গেল তেরো শতকের মাঝামাঝি। ইংলণ্ড ফ্রান্স স্পেন প্রভৃতি এক একটি জাতির রাষ্ট্রের পত্তন হল। পোপের প্রাধান্য ধীরে ধীরে কমতে লাগল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল। সাধরণ মানুষ ক্রমে ক্রমে জানতে পারল যে পোপ আর সম্রাটের দ্বন্দ্ব আসলে একটা সামন্ত যুগের অধিকারের লড়াই। ধর্মের অন্ধ দাসত্ব থেকে মুক্ত না হলে শ্রেণী ও দলগত স্বার্থ কায়েম থাকবে।

ক্যারোলিঞ্জিয়ন বংশ শেষ হলে এল জার্মন সম্রাট-গোষ্ঠী এবং সেই সময় থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠল। মধ্যে মধ্যে আপস হয়েছে সভা ডেকে, কিন্তু একেবারে নিষ্পত্তি হয় নি। পোপ-সম্রাট দ্বন্দ্বের প্রকৃত অবসান হল সাম্রাজ্যলোপের সঙ্গে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসল কারণ আগে বলা হইয়াছে। এখন তাই থেকে উদ্ভব হল দ্বিতীয় প্রশ্নের। প্রশ্নটি হল—বিশপ বা প্রধান ধর্মযাজকদের গদিতে বসাবার অধিকার কার? বিশপদের আনুগত্য কার প্রতি? পোপের না সম্রাটের প্রতি? উপলক্ষটা ছিল এই: বিশপ যখন তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হতেন, তখন তাঁর হাতে একটি আংটি ও ক্রোজিয়ার বা দণ্ড দেওয়া হয় তাঁর ক্ষমতার ও উচ্চপদের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে। এগুলি বিশপ নিতেন সম্রাটের কাছ থেকে। এরই নাম **ইনভেস্ট্রিচ্যর**। দান গ্রহণের পর বিশপ সম্রাটের দুই হাতের মধ্যে নিজের হাত রাখতেন। এর মানে দাঁড়ায় যে বিশপ তাঁর পদাধিকার

পাচ্ছেন সম্রাট অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাছ থেকে। সম্রাটের পক্ষ থেকে এই দাবি উঠল যে বিশপ অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তির মতই একজন বড় সামন্ত। সেকালের বিশপদের এলাকা ছিল বিস্তীর্ণ তার মধ্যে ছিল বিশাল জমিদারি এবং সেই জমিদারির আয়, খাজনা ও ধর্মসংক্রান্ত নানারকম কর মিলিয়ে বিশপদের সম্পদ হত প্রচুর। বিশপ যখন অভিজাত সামন্তের মতই এই সব স্বত্ব ভোগ করছেন রাজ্যের মধ্যে বাস করে, তখন তাঁকে গদি দেওয়া অর্থাৎ তাঁর হাতে ক্ষমতা ও এলাকার যাবতীয় সম্পত্তি ন্যস্ত করার অধিকার সম্রাটেরই।

পোপরা একথা মানতে চাইতেন না। যুদ্ধবিগ্রহে ও রক্তক্ষয়ে সম্রাটের কলুষিত হাত থেকে এই পবিত্র অধিকার নেওয়া চলে না। বিশপকে পদাধিকার দেওয়ার ভার একমাত্র পোপেরই। ধর্মযাজকেরা পোপেরই বশ্য, সম্রাটকে বশ্যতা দেখালে ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য কমে যাবে। পোপ ও সম্রাট দুই পক্ষই এই **'ইনভেস্টিচ্যর'** প্রশ্ন নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন। জার্মন **সম্রাট চতুর্থ হেনরি** পোপ **সপ্তম গ্রেগরির** সঙ্গে ভীষণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেন। তিনি পোপকে 'জাল' সন্ন্যাসী, 'ভণ্ড' বলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আর একজনকে পোপ বলে খাড়া করেন। পোপও সম্রাটকে জাতিচ্যুত, মানে ধর্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত করেন। সম্রাট হেনরি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করলেন, **ক্যানোসায়** পোপ-প্রাসাদের বাইরে শীতের ঠাণ্ডায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে। ফলে সাময়িক আপস হল। আর এক প্রবল প্রতাপশালী পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছিলেন। এখন ধর্মের নামে প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের দাবি করলেও সব পোপ বা বিশপ কিন্তু সদাচারী নির্মলচরিত্র লোক ছিলেন না। কেউ কেউ ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় মগ্ন থাকতেন, কেউ বা ক্ষমতা বাড়াবার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন। অসৎ উপায়ে, যেমন ক্ষমা ও অনুগ্রহ বিতরণ করে, নিজের অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ করতেন। এই জন্য ধর্মীয় সংস্কারের দরকার হয় যাতে খ্রীস্টধর্মের শুচিতা সংযম নিয়ম প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ না হয়। মঠে বা আশ্রমে সন্ন্যাসীদের আদর্শ জীবন কি ভাবে পালিত হবে, তাই নিয়ে একটি আন্দোলন ও সংগঠন তৈরী হয়।

আগে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি বলে নিয়ে তারপর মধ্য যুগে ধর্মজীবনের কেন্দ্র ঐ মঠগুলির উৎপত্তি, সংগঠন, মঠবাসীদের জীবন ও কর্তব্য, তাদের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বিষয়গুলি পরে বলছি। তাতে বোঝার সুবিধা হবে।

ধর্ম ও যাজকদলঃ যদিও এ যুগে রাজারা যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, সমাজে ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ মানুষ যাজকদের সম্মান করত। সেকালে পাদরীরাই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত লোক। লেখাপড়া জানতেন বলে তাঁদের 'ক্লার্ক' বলা হত। এঁরা সকলেই অবশ্য সাধু ছিলেন না। কেউ কেউ জমি ও অর্থ সঞ্চয় করে রীতিমত শক্তিশালী হতেন। পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে বিশপই ছিলেন প্রধান। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পাদ্রী ছিলেন ভাল মানুষ। রোগে শোকে তিনি সেবা সান্ত্বনা ও উপদেশ দিতেন। সে যুগে তাঁদের বিবাহ করার নিয়ম ছিল না, অবিবাহিত থেকে ধর্মে

কর্মে অনুরক্ত থাকাই ছিল যাজক জীবনের আদর্শ। কেউ কেউ নিয়ম ভঙ্গ করে সংসারীর মত অর্থ ও আরাম চাইতেন। তাতে ধর্মজগতে বেশ কিছুদিন অনাচার দেখা গিয়েছিল।

মঠের উৎপত্তি ও মঠের জীবন : মঠগুলি ছিল মধ্যযুগের ধর্ম ও শিক্ষার প্রাণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন অনেক জমি জায়গা নিয়ে মঠ স্থাপন করা হত। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার হয়ত মঠে অর্থদান করলেন, কেউ বা মৃত্যুকালে মঠের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলেন। এই ভাবে অনেক মঠ প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। মঠের অধ্যক্ষকে **অ্যাবট** বলা হত, তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। অ্যাবট থাকতেন তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে। অন্যান্য পুরোহিত বা সন্ন্যাসী মঠের মধ্যে একত্র বাস করতেন। আশেপাশে সমস্ত গ্রাম ও নগর অ্যাবটকে মান্য করত অ্যাবটের সহকারীকে **প্রায়র** বলা হত। প্রায়রের নীচেও অনেক শ্রেণীর যাজক ছিলেন। সকলের নীচে মঙ্ক বা সাধারণ ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী। এঁরা মঠের সেবায় নিযুক্ত থেকে সারাদিন পরিশ্রম করতেন আর অবসর সময়ে প্রার্থনা উপাসনায় ব্যস্ত থাকতেন। পুরুষদের মঠের নাম **অ্যাবি**। **নান্** বা সন্ন্যাসিনীরা পৃথক মঠে থাকতেন, তাকে **'নানারি'** বলা হত। নানারিতেও **অ্যাবেস** অধ্যক্ষের কাজ করতেন। মঠে নানাপ্রকার নিয়ম মানতে হত। পড়াশুনা, প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ, ল্যাটিন ভাষার চর্চা, নীরব ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন এইগুলি মঠবাসীর অবশ্য-কর্তব্য। সেকালে মঠগুলি অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করত। নিজস্ব খেত-খামারে জমি চাষ, ইঁট তৈরি, পাথর ও কাঠের কাজ প্রভৃতি নানারকম জীবিকা জোগাত স্থানীয় বহু লোককে। পথিকদের আশ্রয় দান, আর্ত ও পীড়িতের সেবা, গরীবদের সাহায্য আর অশিক্ষিত লোকদের লেখাপড়া শেখানো, এ সব কাজ মঠ থেকে সম্পন্ন হত। কালক্রমে মঠের অধিবাসীরা বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠল, নৈতিক জীবনে ও কর্তব্যপালনে শিথিলতা এসে গেল। তাই সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা উন্নত করার জন্য সংস্কারের দরকার হল।

প্রায়র মঙ্ক

মঠ সংগঠনের কাজে সেন্ট বেনেডিক্টের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি মঠবাসীদের নিত্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য যে সব বিধিনির্দেশ লিপিবদ্ধ করে যান, সেই অনুসারে বেশির ভাগ মঠের জীবন পরিচালিত হত। এই নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী যাঁরা সন্ন্যাসধর্ম নিতেন তাঁদের দারিদ্র্য বরণ, ব্রহ্মচর্য পালন ও বশ্যতা স্বীকার—এই তিনটি শপথ নিতে হত। 'মঙ্ক' হতে গেলে কিছুদিন নবিশ হয়ে যোগ্যতা অর্জন-করতে হত। মঙ্কদের বিবাহ করা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা নিষিদ্ধ ছিল। সেন্ট বেনেডিক্ট নিজে সাধু, মঙ্কদের সাধু জীবনের অভ্যাসে দীক্ষিত করে যান। যে সব সন্ন্যাসী তাঁর প্রবর্তিত

নিয়মকাকুন মেনে চলতেন, তাঁরা 'বেনেডিক্ট সম্প্রদায়' নামে পরিচিত হন। এই সম্প্রদাদের অনেক মঠ ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সেখানে সংযম শৃঙ্খলা পবিত্রতা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করা হত। এগুলোর মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল **'ক্লুনিরমঠ'**, যেটি ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি প্রদেশে স্থাপিত হয় ৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এখান থেকেই মধ্য যুগের য়ুরোপে একটি বিরাট ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন প্রসারিত হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল, খ্রীষ্ট-ধর্মকে অনাচার থেকে মুক্ত করা এবং সামন্ত-সমাজ আর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে 'চার্চ'কে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা।

সেণ্ট বেনেডিক্ট

এক কালে মঠের সন্ন্যাসীরাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করে বড় বড় বিদ্যাপীঠের সূচনা করেন। যে সব সন্ন্যাসী ঘুরে ঘুরে উপদেশ প্রচার করতেন, তাঁদের ফ্রায়ার বলা হত। ফ্রায়ারদের বিভিন্ন দল বা ভ্রাতৃ-সংঘ ছিল। সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁদের সুনাম ছিল। এ ছাড়া আরও দুটি শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব যোদ্ধা সেবা-ধর্মের কাজের ভার নিতেন, তারা 'সোলজ্যর প্রিস্ট' বা 'যোদ্ধা সন্ন্যাসী', আর যাঁরা সৈনিকবেশে ধর্ম যুদ্ধে সঙ্গ নিতেন, তাদের 'ফাইটিং মঙ্ক', বা সন্ন্যাসী যোদ্ধা বলা হত।

ফ্রায়ার

বিশ্ববিদ্যালয় এগারো-বারো শতক ঃ অনেক অবসর ও পুঁথিপত্র পেলে বিদ্যাচর্চার সুযোগ সুবিধা হয়। সে জন্য নালন্দা, বোগদাদ, কর্ডোভা প্রভৃতি মধ্যযুগের বিদ্যাপীঠগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্রসমাগম হত, তাই এদের **বিশ্ববিদ্যালয়** বলা হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে এই রকম কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়। মঠ ও গির্জার সঙ্গে সংলগ্ন বিদ্যাপীঠগুলি ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে। অনেক সময় নামকরা অধ্যাপকরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। ভ্রাম্যমান অধ্যাপক আর পর্যটক ছাত্রদল, এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থা। তারপর কোন একটি বিদ্যাপীঠে

হয়তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার চর্চা শুরু হলে সেখানে অধ্যাপক ও ছাত্ররা থেকে যেতেন। দেখাদেখি আরও ছাত্র ও শিক্ষক এসে গেলেন। এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রসার ও উন্নতি হয়। মধ্য যুগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল **প্যারিসে**, এখানে ধর্মশাস্ত্রের খুব চর্চা হত। দক্ষিণ ইটালিতে **স্যালার্নো** ছিল চিকিৎসা-বিদ্যার কেন্দ্র, উত্তর ইটালিতে **বোলোন্যা** ছিল আইন চর্চার জন্য বিখ্যাত। ইংলণ্ডেও **অক্সফোর্ড** এবং তার পরে **কেম্‌ব্রিজ** বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আবার বোহেমিয়ার প্রাগ্ শহর থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদল সরে এসে জার্মানিতে **লাইপ্‌জিগ্** বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। অধিকাংশ জায়গায় গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন তর্কশাস্ত্র, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের রচনা, রোমান আইন এবং খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হত।

ছাত্রজীবন ঃ এখন এই বিদ্যাপীঠগুলি কি ভাবে পরিচালিত হত, সেখানে কি কি বিষয় পাঠ্য ছিল, তা জেনে রাখো। কোন কোন বিদ্যাপীঠ পরিচালনা করতেন অধ্যাপকদল, কোথাও বা কর্তৃত্ব করতেন ছাত্র-সমাজ। প্রত্যেক বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন বিভাগ ছিল, পাঠ্যবিষয় অনুযায়ী ছাত্রদেরও ভাগ করা হত। এক একটি ছাত্রসমষ্টির নাম ছিল **নেশ্যন**। প্রতি নেশ্যনের পরিচালককে ছাত্ররাই নির্বাচন করত। ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার-শাস্ত্র, গণিত, জ্যামিতি, আকাশতত্ব ও সঙ্গীত, এইসব ছিল সাধারণ বিভাগের পাঠ্যসূচী। পাঁচ বছরের পাঠক্রম শেষ করলে ছাত্ররা ডিগ্রী পেতেন। তারপর যিনি আরও তিন বছর পড়াশুনা করতেন, তিনি 'মাস্টার অফ আর্টস' উপাধি পেতেন। সেকালে ছাপাবইয়ের অভাবে শিক্ষা-প্রণালী ছিল অন্য রকমের। অধ্যাপক নিজে পুঁথি পড়ে শোনাতেন ও টীকা করতেন। ছাত্ররা সেই ব্যাখ্যা টুকে নিত। অধ্যাপকের বক্তৃতার উপরই নির্ভর করতে হত, কারণ একখানি গ্রন্থের অনেকগুলি নকল-করা পুঁথি পাওয়া দুষ্কর। তবে বিদ্যা যাই হোক, ছাত্রদের স্মৃতিশক্তির চর্চা ও চিন্তা করার অভ্যাস করতে হত।

ছাত্রদের বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল না। যেখানে সুবিধা হত সেখানেই তারা ব্যবস্থা করে নিত। ছাত্রদের বেতনই শিক্ষকদের সম্বল। ছাত্রসংখ্যা কমলে আয়ও কমে যেত। তাই গরিব ছাত্র আর দরিদ্র অধ্যাপক উভয়েরই অবস্থা সমান ছিল। তবে সাধারণতঃ ছাত্র-অধ্যাপকদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। শহরের লোকের সঙ্গে তখনকার দিনে প্রায়ই গণ্ডগোল বাধত। সব ছাত্রই কিন্তু শান্তশিষ্ট ছিল না, মধ্যে মধ্যে নগরে গিয়ে উৎপাত করলে নগরবাসীদের সঙ্গে ছাত্রদের রীতিমত মারামারি হত। ঝগড়া মিটিয়ে দুর্দান্ত ছাত্রদের বশে আনতেন অধ্যাপক ও সতীর্থরা। একেই **'টাউন ও গাউনের'** বিবাদ বলা হত, কারণ সে যুগে ছাত্রদের গাউন পড়তে হত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংঘবদ্ধ ছিল বলেই টিকে ছিল, নইলে নগরবাসীরা ছাত্রদের যে বিষনজরে দেখত, তাতে অনেক বিদ্যা-পীঠেরই উঠে যাওয়ার কথা। একবার সুবিধা পেয়ে প্যারিসের লোকরা দুষ্ট ছাত্রদের খুব মারল। চটে গিয়ে সশিষ্য অধ্যাপকরা বিদ্যালয়ের দরজা তালাবন্ধ করে শহর ছেড়ে

চলে গেলেন। পরে প্যারিসবাসীরা তাদের আশ্বাস দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হল।

"স্কুল মেন" ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে 'স্কুল-মেন'দের দান অনেক। দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা ও গবেষণা করতেন, তাদের বলা হত 'স্কুল-মেন'। মধ্য যুগের চিন্তাশীল পণ্ডিতদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত ছিলেন **পিটার অ্যাবেলার্ড**। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনি বলতেন, বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে যা সত্য বলে প্রমাণিত হবে তাই সত্য, অর্থাৎ বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি বড়। যারা গোঁড়া খ্রীষ্টান, তারা ভুল বুঝল। ভাবল, অ্যাবেলার্ড নাস্তিক এবং ছাত্রদের ঈশ্বরে অবিশ্বাস শেখাচ্ছেন। তার বিখ্যাত বইয়ের নাম **'হাঁ ও না'**, তাতে অনেক তর্ক-আলোচনা আছে। অ্যাবেলার্ডের দুই শিষ্য **আর্নলড** এবং **পিটার লম্বার্ডিও** পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত হন। **রোজার বেকন** ছিলেন আর এক মস্ত পণ্ডিত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। অনেক পূর্বেই তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের কথা ভাবেন। সাহসী মতামতের জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। **অ্যালবার্ট ম্যাগনাসও** বিজ্ঞান চর্চা করতেন। তবে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন **টমাস অ্যাকুইনাস্**। তিনি দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। তিনিও যুক্তি দিয়ে সত্যের বিচার করতেন। এই সব পণ্ডিতদের বক্তৃতা রচনার ফলে মধ্য যুগে জ্ঞানের বহুল প্রসার হয়। শুধু শিক্ষা নয়, সাহিত্যেও অনেক নতুন সৃষ্টি হতে লাগল। ল্যাটিন পণ্ডিতের ভাষা, তাই তার সমাদর। কিন্তু এ যুগে দেশীভাষারও চর্চা সুরু হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালিতে মাতৃভাষার সাহিত্য রচিত হতে থাকে।

মধ্য যুগের দুই বড় কবির নাম না করলে সাহিত্যের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইটালির মহাকবি **দান্তে** মাতৃভাষায় **ডিভাইন কমেডি** নামে এক অপূর্ব কাব্য রচনা করেন। এই মহাকাব্য তিন খণ্ডে লেখা। শাস্তি ও অনুতাপের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মা ভগবানের কাছে কেমন করে পৌঁছায়, দান্তে সেই কাহিনী আশ্চর্য কল্পনায় চিত্রিত করেছেন। এই কাহিনী আশ্চর্য কল্পনার অমূল্য সম্পদ ইটালির আর এক লেখক **বোকাচ্চিওর** গল্প পড়ে ইংরেজ **কবি চ্যসার** তাঁর বিখ্যাত **ক্যাণ্টারব্যরি টেল্স্** লেখেন। সে যুগে অনেক লোক ক্যান্টারব্যারি প্রভৃতি তীর্থস্থানে যেত। চ্যসারের কাব্যে কয়েকজন যাত্রী এই ভাবে গল্প করতে করতে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কবি নিজেও আছেন। গল্পগুলি বড় সুন্দর ও মজার।

চ্যসার

গথিক শিল্প ঃ মধ্য যুগের স্থাপত্য শিল্পেও এক নতুন রূপ দেখা গেল। বড় বড় বাড়ি, গির্জা (ক্যাথিড্রাল) ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে সে যুগের শিল্পীরা যে কৌশল দেখিয়ে গেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। মধ্য যুগের গোড়ার দিকে যে স্থাপত্য

রীতির প্রচলন ছিল, তাকে 'রোম্যানেস্ক্' রীতি বলা হয়। পরে 'গথিক' রীতির
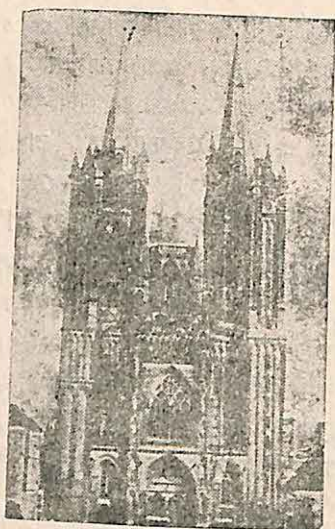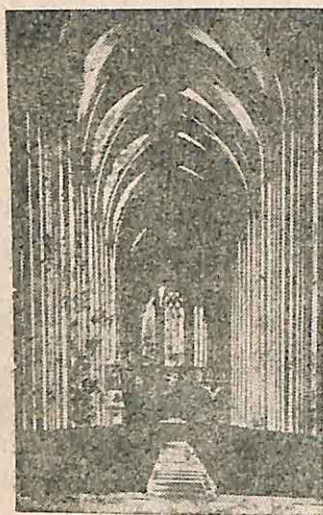
গথিক শিল্পের নমুনা—(১) গির্জার ভিতরের দৃশ্য (২) গীর্জার বাইরের দৃশ্য

প্রবর্তন হয়। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধ শহরগুলিতে গথিক কায়দায় অনেক গির্জা তৈরি হয়। এই গথিকশিল্পের অনেক নিদর্শন এখনও বর্তমান। **রিমসের ও নোতরদামে** ক্যাথিড্রাল লণ্ডনের সুবিখ্যাত **ওয়েষ্টমিনষ্টার** গির্জা এই রীতির উৎকৃষ্ট নমুনা। সেযুগের শিল্পী ও কারিগর তাদের সমস্ত কলানৈপুণ্য ঐ সব গির্জার অলংকার শোভায় নিযুক্ত করেছিল, যেমন ভারতের শিল্পীরা মন্দির স্থাপত্যে তাদের আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে। কলকাতার হাইকোর্ট গথিক রঁথিক রীতিতে তৈরী। ছবি দেখলেই বোঝা যায়, খিলান ও জানলাগুলি
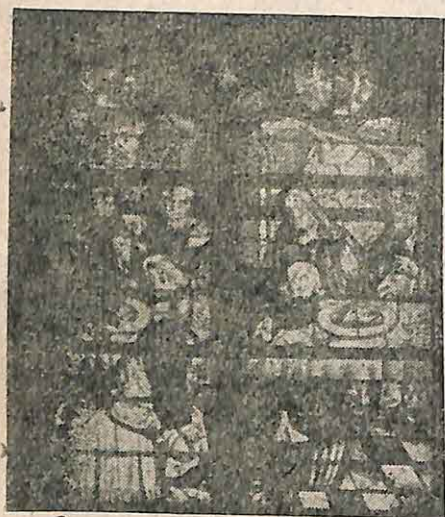
স্টেণ্ড গ্লাস

নীচে থেকে উপর দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠেছে। আগে দেয়ালগুলি খুব মোটা হত আর খিলানগুলিও ছিল গম্বুজের মত কিছুটা গোলাকার। কিন্তু তাতে ভিতরটা অন্ধকার হয়ে থাকত। তাই আলো আনবার জন্য বড় বড় কোণাকৃতি জানলা বসান হত। পাথরের ভারী ছাদ ধরে রাখবার জন্য গথিক শিল্পীরা দেয়াল পুরু না করে ঐ রকম কোন বিশিষ্ট খিলান ব্যবহার করতে লাগল, ক্যাথিড্রালগুলির গম্ভীর-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সীসা দিয়ে জোড়ালাগানো বিচিত্র রঙিন সারসি জানলায় লাগান হত। একে বলা হয় ষ্টেণ্ড গ্লাস।

অনুশীলনী

১। 'ক্লার্ক' কাদের বলা হত?
২। যাজকদের মধ্যে কি রকম শ্রেণী-বিভাগ ছিল?
৩। মঠের উৎপত্তি হয় কি ভাবে? মঠের অধ্যক্ষকে কি বলা হত?
৪। মঠের জীবন ও সংগঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর?
৫। মঠের জীবনযাত্রা সংস্কারের দরকার হয়েছিল কেন?
৬। সেণ্ট বেনেডিক্ট কে? তিনি কি করেছিলেন?
৭। 'ক্লুনি' কোথায়? কি কারণে তা বিখ্যাত?
৮। মধ্য যুগে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর। সেখানে কি কি পড়ানো হত?
৯। সেখানকার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কি জেনেছ?
১০। "স্কুল মেন" কাদের বলা হত?
১১। অ্যাবেলার্ড কি জন্য বিখ্যাত? তাঁর বইয়ের নাম কি?
১২। চ্যসার ও দান্তে কি গ্রন্থ রচনা করেন?
১৩। 'গথিক শিল্প' কাকে বলে? কয়েকটি বড় বিখ্যাত গথিক গির্জার নাম কর।
১৪। গির্জার খিলান কিভাবে তৈরী হত? স্টেণ্ড গ্লাস কি জিনিস?

সপ্তম অধ্যায়

মধ্য যুগে পশ্চিম য়ুরোপের সমাজ ও জীবন

ফিউডালিজম বা সামন্তপ্রথা ঃ শার্লমানের মৃত্যুর পর মধ্যযুগের য়ুরোপে কয়েকটি পরিবর্তন দেখা দিল। এই সময়ে সামন্ত-প্রথার উদ্ভব হয়, ধর্মের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে! ফলে সমাজ ও জীবন বদলাতে থাকে। সকলের উপরে রাজা। তিনি দেশের সমস্ত জমির মালিক, শ্রেষ্ঠ ভূস্বামী। টেন্যাণ্ট-ইন-চীফ তিনি এই সব জমি সব চেয়ে বড় প্রজা
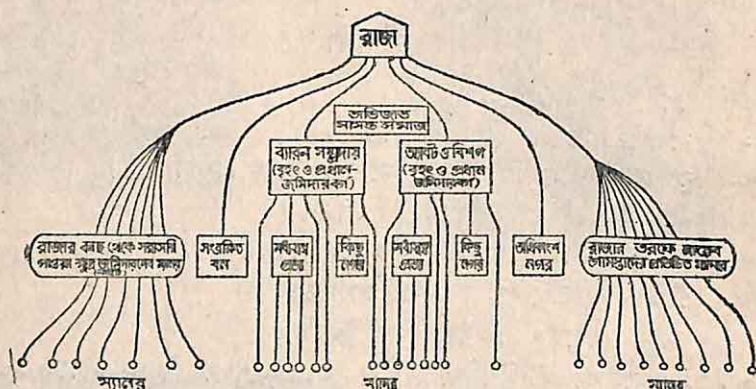
সামন্ত সমাজের গঠন—ম্যানর প্রথার উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি

অর্থাৎ ব্যারন বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। শর্ত ছিল, আনুগত্য স্বীকার ও যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা। জমিদাররা আবার তাঁদের জমির অনেক অংশ মধ্য প্রজাদের মধ্যে বিলি করতেন—শর্ত ঐ একই রকমের। এই ভাবে স্তর অনুসারে নিম্নতম প্রজা পর্যন্ত একটা পরস্পর সম্পর্ক ও দায়িত্ব স্থির করা হল। একেই সামন্ত-প্রথা বলে। অনেকটা যেন পিরামিড আকারে সমাজ। উপরে রাজা, তাঁর নীচে অভিজাত সামন্তবর্গ, তার পর উপসামন্ত অর্থাৎ বড় ও ছোট জমিদারের দল। এই ভাবে সব চেয়ে নিম্নস্তরে ছিল দরিদ্র সাধারণ। এদের মধ্যে যাদের অবস্থা কিছু ভালো, তাদের বলা হত 'ভিল্যান' (villein)। আর 'সার্ফ' (serf) হল ভূ দাস, তারা জমি নিয়ে মেহনত করত কিন্তু কোন অধিকার তাদের ছিল না।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন যে সামন্ত-প্রথার বীজ মধ্যযুগেরও আগে লক্ষ্য করা যায়। তবে মধ্য যুগেই তা পরিস্ফুট হয়ে একটি বিশেষ চেহারা নেয় এবং ছয় সাতশো বছর ধরে য়ুরোপের সমাজকে চালিত করে। এই সুদীর্ঘ কাল 'সামন্তপ্রথার যুগ' বলে ইতিহাসে চিহ্নিত। এখন সামন্তপ্রথা বলতে কি বোঝায়, এই সামন্তযুগের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণই বা

কি এগুলি ঠিক ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। প্রাচীন যুগ থেকে সমাজের বন্ধন অর্থাৎ সমষ্টিভাবে মানুষের জীবন এবং পরস্পর সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। জার্মনই হোক বা আরবীই হোক, তাদের উপজাতিগুলির মধ্যে একটা সংঘবদ্ধ জীবন ছিল, সেখান পরস্পরসম্পর্ক স্বীকৃত হত। রোমের সমাজে দেখি, সামাজিক সম্পর্ক পরিষ্কার নির্দিষ্ট হয়েছে। সেখানে দুই শ্রেণী উল্লেখ পাই, 'জেণ্টস' ও 'ক্লায়েণ্টস', অর্থাৎ উচ্চ ভদ্রশ্রেণী এবং তার সঙ্গে যুক্ত, অনুচর শ্রেণী। অনুচররা ক্রীতদাস নয়, কিন্তু স্বাধীন হলেও তারা উচ্চ শ্রেণীরই অনুগত দল। রোমের সমাজে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল অনেক। মোটামুটি মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল পৃষ্টপোষক আর অনুগ্রহপুষ্ট, প্রভু ও ভৃত্য, এই রকম।

রোমের প্রভাবশালী 'সেনেটর' বড় মানুষরা থাকতেন 'ভিলা'য় অনেক জমি ও লোকজন নিয়ে। আশপাশের প্রজারা মালিকের জমি চাষ করে ফসল তুলত, তাঁদের দরকার মতো বাড়ীঘর তৈরী করত, পথঘাট মেরামত করে দিত। তার বদলে 'ভিলা'র কর্তা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। পরিশ্রম ও কাজের বিনিময়ে আশ্রয় ও অনুগ্রহ লাভ, এই থেকে এল রক্ষিত ও রক্ষক সম্বন্ধ। টিউটনরা যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস সুরু করে, তখন তারা রোমান সমাজ ব্যবস্থা থেকে কিছু কিছু শিখে আপনাদের সমাজ বন্ধন গড়ে তোলে। সেখানে দলপতি আর দলের অনুচরদের মধ্যে সম্পর্ককে 'কমিটেটাস' বল হত। পণ্ডিতরা বলেন, ঐ 'ভিলা' প্রথা এবং 'কমিটেটাস' মিলিয়েই 'ফিউডালিজম' বা সামন্ত প্রথার জন্ম।

এখন সামন্তপ্রথা কি জিনিস, তার লক্ষণগুলি কি, তা জানতে হবে। সামন্তপ্রথা আসলে সামন্তদের নিয়েই গঠিত, বড় মাঝারি বা ছোট। কালক্রমে অভিজাত, সামন্ত, উপসামন্ত, জমিদার শ্রেণী ছাড়াও সাধারণ মানুষ, নীচের তলার মানুষ সবাই সামন্তপ্রথার বিধিনিয়মে আবদ্ধ হল, সেই মত জীবন-যাপন করতে লাগল। তাহলে, সামন্তপ্রথা হল এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্ট ছক্। অনেকটা মুসলিম শাসন যুগের জায়গীর প্রথার মতো। এখন, এই সামন্তপ্রথার ভিত্তি কি? সামন্ত যুগের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, জমি এবং জমির ভোগ দখলের মেয়াদ ও শর্ত। জমি আর মাটি জলবায়ুর মতই অত্যাবশ্যক, আর জমি নিয়েই সামন্তপ্রথার চলন। মানুষ চিরকালই ভূমি ও ভূমিজাত দ্রব্য চেয়ে এসেছে। কাজেই জমি ও জমিতে উৎপন্ন খাদ্য ও ফসলের মালিকানা বা স্বত্ব, তার বণ্টন বা ভাগের নিয়ম ও শর্তগুলি নির্দিষ্ট করা সব চেয়ে দরকারী হয়ে পড়ল। সামন্তপ্রথার লিখিত অলিখিত আইন-কানুনগুলি সেই কাজ করেছিল।

কি ভাবে করেছিল, তা প্রথমে বলা হয়েছে। শর্ত সেই একই সব ক্ষেত্রে—লোকজন দিয়ে সাহয্যের প্রতিশ্রুতি। সবচেয়ে নীচু প্রজারা আর কি সাহায্য দেবে উপরওলাকে? তারা দরিদ্র স্বত্বহীন প্রজা, ফসলের সামান্য ভাগ নিয়ে কায়ক্লেশে দিনপাত করে। তাই তারা মেহনতি কাজ দিয়ে মনিবের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাত। দৈহিক পরিশ্রম হল তার খাজনার পরিমাপ। তা হলে দেখা গেল, সামন্তপ্রথার ভিত্তি আধা সামরিক।

যুদ্ধবিগ্রহের যুদ্ধে সৈন্য সাহায্য ও লোকবলের দরকার। রাজাকে তাদের তাই দিতে হত, বদলে তারা জমি ভোগ করত। সামন্ত প্রথার দুটি মূল সূত্র। একটি হল, জমির ভোগদখল প্রাপ্তি (ইংরেজিতে টেনিয়র), দ্বিতীয়টি সেবা অর্থাৎ সাহায্য দান (সার্ভিস)। উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধন হল শপথ করে আনুগত্য স্বীকার। বিভিন্ন দেশে সামন্ত প্রথার রূপ বিভিন্ন, কিন্তু মোটামুটি কতকগুলি লক্ষণে মিল দেখা যায়। মধ্যযুগের য়ুরোপের সমাজ-সম্পর্ক ঐ ভাবে স্থির ও নির্দিষ্ট হয়েছিল। সামন্তপ্রথার অবশ্যম্ভাবী কুফল হল (১) অভিজাত সামন্তদের শক্তিবৃদ্ধি, অর্থাৎ নিজ নিজ সৈন্যদল পুষে সরকারী ক্ষমতাকে টেক্কা দিয়ে নিজস্ব এক্তিয়ার বিস্তার, ফলে রাজশক্তির হ্রাস, আর (২) অত্যাচারে দুস্থ চাষীদের দিন দিন অবনতি এবং জন্মগত ভূমিদাস প্রথার চলন। চাপে পড়ে চাষীরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হত। ইংলণ্ডে ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে এক বড় কৃষকবিদ্রোহ হয়ে ছিল। এই দুর্দশা এড়াবার জন্য নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক বাসস্থান ছেড়ে অন্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে নগরে আশ্রয় নিত, স্বাধীন কারিগরের কাজ জোগাড় করত। নয় তো মঠে বা আশ্রমে আশ্রয় নিত সেখানে নিরুপদ্রব শান্তি। তবু সেই যুগে এই সামন্তপ্রথা মানুষের মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক সূত্র বেঁধে দিয়েছিল এবং জমির মাধ্যমে একটি আর্থিক ব্যবস্থাও খাড়া করেছিল। আর এ যুগের পরিবেশে ও ধর্মের প্রেরণায়, সাহিত্যও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও একটি নতুন পথ ও পদ্ধতি সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

আনুগত্য স্বীকার

ভিল্যন ও সার্ফ ঃ সম্ভ্রান্ত লোকদের বিশেষ কিছু করতে হত না, প্রজারই জমি চাষ করত, তাদের পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে দিন চলত। ছোট বড় মাঝারি, অনেক ধরনের প্রজা, তাই কৃষকের সংখ্যাই ছিল বেশী। যারা 'ভিল্যন', তারা অনেকটা স্বাধীন প্রজা, ক্ষেতে কাজ করে ফসল তুলে তারা জমিদারকে তুষ্ট রাখত। মনিবের বশ্য থাকবে, এই রকম প্রতিজ্ঞা করতে হত। মনিবও প্রজাকে বিপদের সময় রক্ষণাবেক্ষণ করবার ভার নিতেন। কিন্তু যারা 'সার্ফ', তারা জমি ছেড়ে কোথাও যেতে পারত না। জমির সঙ্গেই

তারা বাঁধা। কোন স্বত্ব ভোগ করত না, জমি ও জমিদারের সেবাই ছিল তাদের প্রধাম কাজ। তবে পয়সা জমিয়ে কেউ কেউ স্বাধীনতা কিনত। অধিকাংশ সার্ফ ছিল মনিবের কাছে আবদ্ধ। শুধু ক্ষেতের কাজ নয়, জঙ্গল কাটা, কাঠ বয়ে আনা, জল তোলা, গম পেষা ইত্যাদি নানারকম মজুরের কাজও তাদের করতে হত বিনা পয়সায়।'

ম্যানর প্রথা, গ্রামাঞ্চলের জীবন ঃ গ্রামাঞ্চলের জমিদার বাড়ীকে 'ম্যানর হাউস' বলা হত। তারই আশেপাশে খামার ও পতিত জমি। চাষের জমি তেমন নির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করা থাকত না, মধ্যে মধ্যে আল ও বেড়া দিয়ে চিহ্ন করা হত মাত্র। ছবি থেকে বোঝা যাবে, এক এক খণ্ড জমি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হত। ভিল্যান
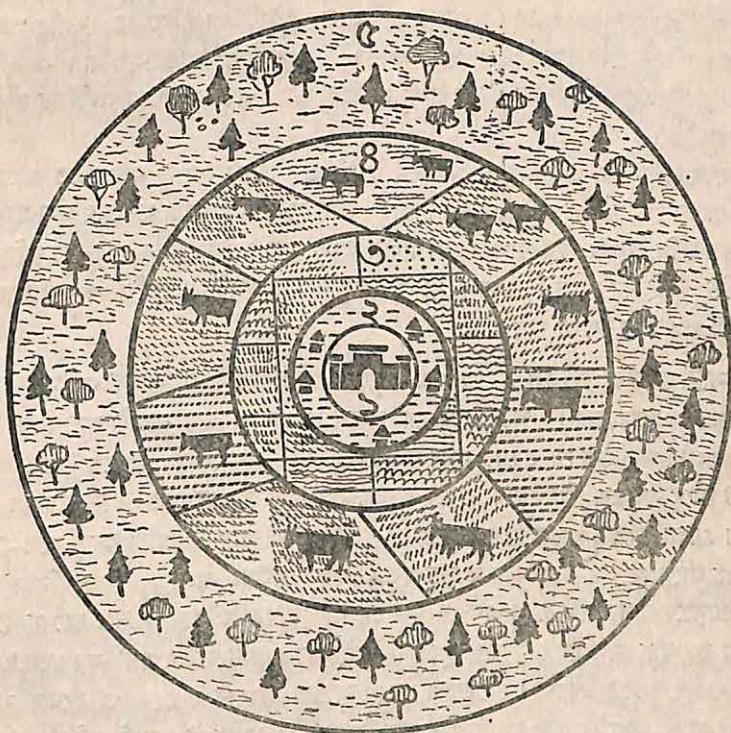
১। 'ম্যানর' কুঠি, আসপাশে বাসগৃহ ২। জমিদারের খাসমহল—এখানে ভূমিদাস ও প্রজাদের কিছু সময় বেগার খাটতে হত। ৩। প্রজাদের চাষের জমি—বিভিন্ন প্রকারের প্লট। ৪। পশুচারণের মাঠ, পতিত জমি ৫। বনাঞ্চল, অরণ্যসম্পদ

ও সার্ফের দল ভাল মন্দ যাই হোক, এক এক টুকরো জমি নিয়ে চাষ করত। এদের জীবন মোটেই সুখের ছিল না, কোন মতে দিন গুজরান হত। চাহিদা অল্প হলেও

ভবিষ্যতের কোন সংস্থান ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছোট ছোট জানালা লাগানো কাঠের কুটির, একটা গাই, চাষের কয়েকটা বলদ আর একপাল শুয়োর। অবস্থা একটু ভালো হলে হয়তো একটা ঘোড়া। মেয়েরাও যথেষ্ট মেহনত করত। সবজি ফলানো, সুতা কাটা, পশম তৈরী করা, জামাকাপড় বানানো এই সব ছিল তাদের নিত্য কাজ। ছেলেমেয়েরা গরু ভেড়া শুয়োর চরাত, পাখী তাড়াত। এইভাবে ছোট কামরায় উনান আর ধোঁয়ার মধ্যে দুঃখের সংসার চলত। আবার মনিব কড়া হলে কষ্টের সীমা থাকত না। গ্রামাঞ্চলে কিছু শ্রমিকও বাস করত যেমন ছুতোর কামার মিস্ত্রী। প্রতি গ্রামেই একটি ছোট গির্জা ও তার পাদ্রি থাকত। নিরানন্দ জীবনে ঐ পাদরীর সান্ত্বনা ও উপদেশই ছিল বড় আশ্রয়। খাওয়ার খুব কষ্ট ছিল। শাক সবজি, মোটা কালো রুটি আর টক মদ—এই হল খাদ্য-পানীয়। কালেভদ্রে মাংস জুটত, তাও আবার বেশীর ভাগ নুন মাখিয়ে শীতকালের জন্য তুলে রাখা হত। উপযুক্ত পোশাকও ছিল না। হয় মোটা পশমের কাপড়ে নয় চামড়ার তৈরী জামা। এই ভাবে অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটত।

মোটের উপর এই ছিল মধ্যযুগে প্রচলিত 'ম্যানর প্রথা' বলা যেতে পারে, গ্রাম-সম্প্রদায়ের পরিশ্রমে চাষ-প্রথা। চাষের জমি আলাদা আলাদা ফসলের জন্য ভাগ করা, পতিত জমি পৃথক করে রাখা, অর্ধস্বাধীন কৃষক আর ভূমিদাসদের মেহনতে কৃষিকাজের পদ্ধতি—এই সব থেকে ফিউডাল বা সামন্তযুগের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও কাঠামো যে ঐ 'ম্যানর প্রথা', তা বোঝা যায়।

সম্ভ্রান্তদের জীবন ঃ সমাজে সবচেয়ে প্রতিপত্তি ছিল 'ব্যারন' ও 'নাইট' অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের। অনেক সময়ে ব্যারন বা বড় সামন্তরা নামেই প্রজা কিন্তু এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠত যে তাদের দমন করা যেত না। এক সময় ইংলণ্ডে তারা পরস্পর জোট বেঁধে রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে অপরজনকে তখ্‌তে বসিয়েছিল। দুর্বল রাজা এদের হাতের পুতুল হয়ে পড়তেন। 'ফিফ্' বা জায়গীর ভোগ করত বলে সামন্তকে রাজার কাছে মুখে নতি স্বীকার করতে হত, কিন্তু কার্যতঃ সামন্তরা নিজ নিজ অঞ্চলে দুর্গ-প্রাসাদে বাস করত, যেন একজন ক্ষুদ্র রাজা। প্রথম জীবনে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা কোন বড় বীর বা যোদ্ধার সঙ্গে ঘুরত। এই বালক ভৃত্য বা 'পেজ' বড় হলে 'স্কোয়ার' হত ও যুদ্ধ করতে শিখত। ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্রের ব্যবহার, দেহের ও মনের শক্তি ও সাহস অর্জন, এগুলি ছিল অবশ্য শিক্ষার বিষয়। তারপর উপযুক্ত বিবেচিত হলে রাজা বা কোন বড় বীর তাদের 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করতেন।

নাইট ঃ নাইট হওয়া এক রকম বিশেষ দীক্ষার ব্যাপার—আগের দিন উপবাসে দেহমন শুদ্ধ করতে হত। হাতে তরবারি নিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে হত। ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে এইভাবে সারারাত জেগে সংযম অভ্যাস করতে হত। তারপর পৃষ্ঠপোষক রাজা অথবা কোন সম্ভ্রান্ত লোক নতজানু প্রার্থীর কাঁধের তরবারি ঠেকিয়ে তাঁকে 'নাইট' করতেন। শুধু নাইট হলেই হয় না, তাঁকে কয়েকটি নিয়ম-কানুন মানতে হত।

একটি বিশেষ ধরনের পবিত্র জীবন যাপন করবার শপথ নিতে হত। নাইটের ধর্ম— সর্বদা সত্য কথা বলা, রাজা ও খ্রীষ্টধর্মকে মেনে চলা, স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা ও শত্রুর কাছে পিছু হটে না আসা, এই চারটি প্রতিশ্রুতি নিতে হত। সকলেই যে অঙ্গীকার মত নাইটের ধর্ম পালন করতেন, তা নয়। কিন্তু সামন্ত প্রথার যুগে যুদ্ধবিগ্রহ আর দলীয় কলহের মধ্যে এমনই একটি বড় আদর্শ দরকার হয়েছিল। এরই নাম **'শিভ্যলরি'** প্রকৃত বীরত্ব। শুধু দেহের নয়, মনেরও। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবেই দুর্দান্ত যুগের রুক্ষ মানুষ নম্রতা ও উদারতা শিখল, তাই শিভ্যল্রি হচ্ছে সামন্ত প্রথা আর খ্রীষ্টধর্মের সম্মিলিত ফল। বহু দেশের গাথায় ও সাহিত্যে 'শিভ্যল্রি'র এই আদর্শ চিত্রিত আছে।

শিরস্ত্রাণ ও বর্মে সুসজ্জিত নাইট

মধ্য যুগ ছিল বীরের যুগ। এ যুগে প্রচলিত জাতীয় কাহিনী, করুণ ও বীর রসের গল্প নিয়ে অনেক গাথা বা কাব্য-চক্র রচিত হয়। **মিনিস্ট্রেল ও ক্রবেদ্যুর** নামে ভ্রাম্যমান গায়ক ও কবির দল এই সব গাথা শুনিয়ে বেড়াতেন। ইংলণ্ডের বীর **রাজা আর্থার** ও তাঁর নাইটদের কীর্তি-কথা, শার্লমানের বীর অনুচর 'পালাদিন'দের শৌর্যকাহিনী ঐ শিভাল্রি-জড়িত গাথা-সাহিত্যের উজ্জ্বল নমুনা। ফ্রান্সেই এর প্রচলন ছিল বেশী। সেখানেই গীতি-কবিতার জন্ম। 'রোলাঁর গান' আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্রান্সে যে সব কবিতা গানের সুর গাওয়া হত, তাদের-ক্যারল' বলা হয়। জার্মানিতে, 'মিনেসিঙ্গার' নামে চারণ কবিরা সুন্দর কবিতা গান করে শোনাতেন, রাজপুত আমলে যেমন চারণদল বীরত্বের কাহিনী গান করে বেড়াতেন।

নাইটদের মধ্যে অনেক রকম 'অর্ডার' বা সম্প্রদায় ছিল। এক এক শ্রেণীর পোশাক, অস্ত্র ও বর্ম এক এক ধরনের। তবে সকলেই মাথায় শিরস্ত্রাণ পরতেন আর গায়ে লোহার চেন বা শিকলের তৈরী বর্ম। কেউ বা ধাতুর তৈরী প্লেটের বর্ম লাগাতেন। যুদ্ধের সময় দেহ ও শির আচ্ছাদন না করলে বর্শা বা তীরের খোঁচা লাগবে। তবে লোহা বা ধাতুর তৈরী অস্ত্রসজ্জার ওজন বড় ভারি হত। যুদ্ধই ছিল নাইটদের বৃত্তি। তাই শান্তির সময়েও নকল যুদ্ধের খেলা হত। রাজসভায় কিংবা সামন্তের দরবারে **ট্যুর্নামেণ্ট** আয়োজন করা হত। মাঝে একটা ব্যবধান, দুদিক থেকে দুই অশ্বারোহী সুসজ্জিত নাইট ছুটে এসে শক্তি পরীক্ষা করতেন। ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে হার, জিতলে পুরস্কার মিলত। এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত। এই বর্ম-আঁটা অশ্বারোহী নাইটদের

সাহস ও যুদ্ধকৌশল আর সামন্তদের সুরক্ষিত দুর্গ-প্রাসাদগুলি একদা য়ুরোপকে শত্রু-আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিল।

দুর্গ-প্রাসাদ ঃ সেকালে বড় বড় দুর্গ-প্রাসাদ ছিল, কোথাও বা ছোট 'ম্যানর'। এই সুরক্ষিত প্রাসাদ বেশির ভাগ পাথরে তৈরী। যে সব অঞ্চলে গোলমাল বা বিদ্রোহ নেই সেখানে 'ম্যানর হাউস' কাঠের তৈরী। অনেক জায়গা নিয়ে প্রাচীর-ঘেরা জমি। পেছন দিকে প্রাসাদ। প্রাচীরের বাইরে চওড়া খাদ, সর্বদাই জলে পূর্ণ। প্রবেশপথে প্রকাণ্ড দরজা। পাল্লার গায়ে লোহার প্লেট ও পেরেক লাগানো। শত্রু আসছে খবর পেলে 'ড্র-ব্রিজ' বা চেন-লাগানো একটি সেতু টেনে ওপরে তোলা হত। অন্য সময়ে সেতু নামানো থাকত। ফটকের গায়ে ছোট জানলা দিয়ে প্রহরী বাইরের দৃশ্য দেখতে পেত। কাঠের পাল্লা ছাড়া আর একটি লোহার কাঁটাতার দিয়ে তৈরী প্রকাণ্ড খাঁচার দরজা ছিল। প্রয়োজন মত সেটিও ওঠানো-নামানো যেত। প্রাচীরের ভেতর খোলা জমি, সেখানে
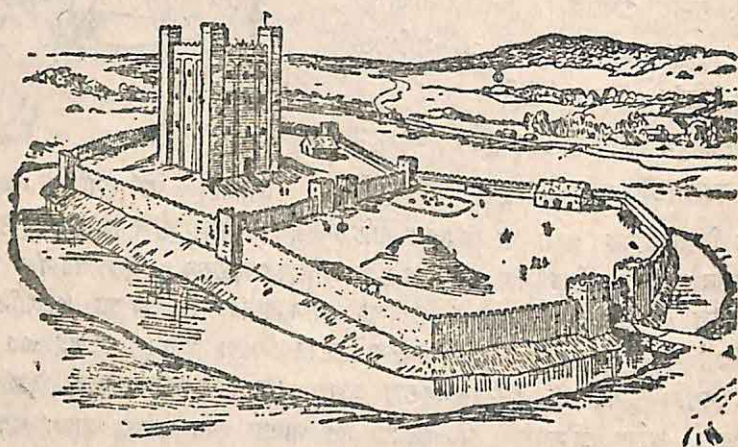
দুর্গ-প্রাসাদ

খামার বাড়ী ও আস্তাবল। তারপরে চত্বর পার হয়ে আবার ফটক প্রাচীর, সব শেষে দুর্গের মত বাড়ী। চার কোণে চূড়া। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে ছাদ। সেখানেও বুক সমান উঁচু দেয়াল, শত্রুর গতিবিধি দেখার জন্য দেওয়ালের গায়ে অনেক ফোকর। মাটির নিচে কারাগার, তার উপর ভাঁড়ার ঘর। বাড়ীর মধ্যে চ্যাপেল বা উপাসনা ঘর, একটি প্রকাণ্ড হল-ঘর, আর কয়েকটি শোবার ঘর থাকত। ঘরের দেওয়াল খুব পুরু, মেঝেয় কাঠের তক্তা। হল্-ঘরে লম্বা টানা টেবিল, কয়েকটি চেয়ার ও জিনিস রাখবার সিন্দুক। আসবাবপত্র বেশী থাকত না। হল্-ঘরে প্রভুত প্রভুপত্নী টেবিলে বসে খেতেন। খাওয়ার আয়োজন ভালও, নানা রকমের মদ ও মাংস, মাছ ও সবজি দেওয়া হত। অনেক পরিচারক, কেউ রাঁধে, কেউ টেবিল সাজায় কেউবা ঘর পরিষ্কার করে। হরিণ-ভেড়ার মাংস ছাড়া, পাখীর তাজা মাংসও খাওয়া চলত। উৎসব ও বিশেষ

নিমন্ত্রণের সময় আস্ত শুয়োর ও ষাঁড় আগুনে ঝলসে টেবিলে রাখা হত। সামন্ত ও নাইটের দল ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে যেতেন, সঙ্গে কুকুর, হাতের কব্‌জিতে শিকলবাঁধা বাজপাখী। এ ছাড়া নাচগান ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের রেওয়াজ ছিল। খুব বড় উঁচু ঘর বলে অনেক বাতি ও মশাল জ্বালাতে হত। সেই আলোয় হল্ ঘরে সামন্ত প্রভু দরবার বসাতেন আর চারণ কবিরা গান শোনাত, বিদূষক হাসি-তামাসায় মনোরঞ্জন করত, যেন ছোট একটি রাজসভা।

মধ্য যুগে য়ুরোপে সামন্ত সমাজের যে বর্ণনা দেওয়া হল, তা থেকে বোঝা যায় যে সে যুগের মানুষ কোনও না কোনও সংঘ বা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে বাস করত। হয় একটি ম্যানর, নয় তো কোনও মঠ কিংবা কোনও কারিগরদের 'গিল্ড' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তবে বেশীর ভাগ লোকই একটা না একটা ম্যানরের লোক, অর্থাৎ সেই ম্যানরের সঙ্গে তার জীবন ও জীবিকা বরাবর যুক্ত বা আবদ্ধ। ম্যানরের বাইরে তার অস্তিত্ব বা পরিচয় নেই। সুতরাং ম্যানর প্রথাই সমস্ত সমাজের মূল বনেদ। যারা অর্ধস্বাধীন ভিলান ও ভূমিদাস সার্ফ তারা কিভাবে ম্যানরের জমিতে লগ্নী হয়ে থাকত, তা আগেই বলা হয়েছে। জমি ছেড়ে যাওয়ার উপায় ছিল না, সুবিধাও ছিল না। কারণ তার নিবাস যে ম্যানরে, সেখানেই তাঁর কুটির, চাষের জন্য ভাগ করা জমির টুকরো আর মাঠে পশু চারণের অধিকার। সন্তানরা তাদের মত ভিল্যান বা সার্ফ হয়ে থাকত। সার্ফদলের উপর ছিল মনিবের মালিকানা। এদের কেউ অন্যত্র বাস করতে গেলে মনিবকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত। এ ছাড়া ছিল নানা রকম খাজনা। গরীব চাষী বলে রেহাই ছিল না, 'চার্চ' ও 'লর্ড' অর্থাৎ গির্জা আর ম্যানর স্বামীর তহবিলে তাদের কর জোগাতে হত, হয় নগদ নয় জিনিস পত্র কিংবা মেহনত দিয়ে।

আগেই বলেছি, রাজার শ্রেষ্ঠ প্রজারা অর্থাৎ লর্ড ব্যারন শ্রেণী ছিলেন নিজ নিজ এলাকায় সর্বময় কর্তা। সেখানে তাঁদের দুর্গ-প্রাসাদ বা ম্যানর বাড়ী, সেই অঞ্চলের শাসন ও শান্তিরক্ষা ছিল তাঁদের দায়িত্ব। লর্ডরা 'ম্যানর-কোর্ট' বা আঞ্চলিক আদালতে বসে বিচার করতেন। অভিযোগ অনুযোগ শুনানির পর মামলার নিষ্পত্তি হত। সে যুগে বিচার তেমন সূক্ষ্ম ছিল না, তবে স্থানীয় রীতি-নীতি বা লোকাচার মেনে চলতে হত উভয় পক্ষকেই! 'লর্ড'রা চাষীদের খুব বেশী পীড়ন করতে ভরসা পেতেন না, কারণ তা হলে তাদের কাছ থেকে ঠিক মত কাজ আদায় করা যেত না। আবার তাদের উৎখাত বা বরখাস্ত করাও সম্ভব ছিল না, যেহেতু তারা 'জমির সঙ্গে বাঁধা।'

সামন্ত সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়—অভিজাত-বর্গ, যাজকদল আর কৃষক-সম্প্রদায়। অ্যাবট ও বিশপ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর যাজকরা যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন বড় বড় সামন্তদের মত, রাজ্যের অনেক তালুক জমি এঁদের ভোগ দখলে ছিল। প্রথম দুই শ্রেণীর ঠিক বিপরীত দিকে ছিল কৃষক-কুল, সংখ্যায় অনেক ভারী। পরে একটি নতুন সম্প্রদায় হল, বিভিন্ন কারিগর-দলের লোক। নানা গলদ ও বৈষম্য

থাকলেও এ কথা বলতে হবে যে ম্যানর প্রথা ও সামন্ত-সমাজ সেই মধ্য যুগের শাসন ব্যবস্থা আর্থিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনকে একটি সংঘবদ্ধ রূপ দিতে পেরেছিল এবং পাঁচ ছয়শো বছর ধরে উপযোগী ও কার্যকর হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। রোমের সমাজে সামন্ত প্রথার কি আভাস পাওয়া যায়।

২। ম্যানর প্রথা সম্বন্ধে কি জেনেছ? কারা এই প্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল?

৩। সম্ভ্রান্ত ও সামন্তরা কি ভাবে জীবন যাপন করতেন? কারা এই প্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল?

৪। 'ভিলা' প্রথা কি রকম?

৫। নাইট কিভাবে দীক্ষিত হতেন? তাঁরা কি প্রতিশ্রুতি দিতেন?

৬। নাইটদের পোশাক কি রকম হত।

৭। সামন্ত প্রথার মূল সূত্র দুটি কি?

৮। সামন্ত প্রথার কুফল কোন্‌গুলি?

৯। দুর্গ-প্রাসাদ বর্ণনা কর।

১০। সার্ফদের জীবনযাত্রা কি রকম ছিল।

দু'এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(১) কোন সময়ে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়?

(২) 'কমিটেটাস' কাকে বলে?

(৩) ভিলান কাদের বলা হত?

(৪) ইংল্যাণ্ডে কার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল?

(৫) ফ্রান্সে যে সব কবিতা গানের সুরে গাওয়া হত তাদের কি নাম?

(৬) সামন্ত প্রথা কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল?

(৭) সামন্ত প্রথার চুক্তিগুলি বুঝিয়ে বল।

(৮) জেণ্টস ও ক্লায়ণ্টস কারা?

অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ

(ক) ভিল্যান বলতে মধ্যযুগের নাইটদের বোঝায়।

(খ) সে যুগের আইন সার্ফদের অনেক অধিকার দিয়েছিল।

(গ) সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে সবার নীচে অবস্থান ছিল যাজকদের।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

মধ্য যুগে য়ুরোপে যা কিছু কাজ হয়েছে, তার পেছনে ধর্মের প্রেরণাই বেশী। মঠে মঙ্কদের জীবন, বিদ্যাপীঠে জ্ঞানের চর্চা, গির্জা নির্মান, সাহিত্য রচনা, সব কিছু খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে জড়িত। তীর্থযাত্রীরাও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য পবিত্র স্থানে যেতেন। সকল তীর্থের সেরা হল **জেরুসালেম** সেখানে যীশুর জীবনের বহু পুণ্যস্মৃতি ছড়ানো। আরবরা যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করে, জেরুসালেম তখন তাদের দখলে আসে। খৃষ্টান তীর্থযাত্রীরা আরব-অধিকারের পরেও এখানে আসতেন। আরবরা বিধর্মী বলে তাঁদের উপর অত্যাচার করত না। যীশুর সমাধী ও অন্যান্য পবিত্র জায়গাগুলি খৃষ্টানরা দেখাশুনা করতেন। কিন্তু তুর্কী মুসলমানরা যখন এ সব অঞ্চল দখল করল, তখন নির্যাতন সুরু হল। তীর্থযাত্রা কষ্টকর ও বিপজ্জনক হয়ে উঠল। তুর্কীরা খৃষ্টানদের মারধোর করত, কখনও বা কারাগারে আটক রাখত। যাত্রীরা দেশে ফিরে সেই সব অত্যাচারের কাহিনী শোনালে খ্রীষ্টান জগতে একটা বড় আন্দোলন জাগল।

শুধু তাই নয়, সমগ্র পশ্চিম এশিয়া মাইনর যখন তুর্কীদের অধিনে চলে গেল, তখন য়ুরোপ ও এসিয়ার মধ্যে বাণিজ্যপথগুলিও তারা আয়ত্ত করে বন্ধ করে দিল। ফলে য়ুরোপীয় বণিকদের অসুবিধা হতে লাগল। বাইজান্টাইন সম্রাট পোপের নিকট আবেদন জানালেন। খৃষ্টান-জগৎ তখন উত্তেজিত। স্থির করা হল, সৈন্যসামন্ত নিয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে, তীর্থভূমিকে মুসলমান অধিকার থেকে মুক্ত করতে হবে। এটি প্রথম 'ক্রুসেড'। 'ক্রুসেড' কথাটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ। অনেক রাজা ও অভিজাত বংশের লোক, সামন্ত ও সন্ন্যাসীদল স্থলপথে ও জলপথে ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলেন। সবসুদ্ধ আটটি ক্রুসেড হয়েছিল, তাদের কয়েকটি কাহিনী বলছি।

প্রথম অভিযান ঃ শোনা যায়, প্রথম ধর্মযুদ্ধের মূলে ছিলেন ফ্রান্সের সন্ন্যাসী পিটার। তিনি জেরুসালেম তীর্থ করতে গিয়ে খৃষ্টানদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেন। দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি নাকি যীশুর সমাধির পাশে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময় স্বপ্নের কতো দৃশ্যে দেখলেন স্বয়ং যীশু তাঁকে বলছেন, এ পবিত্র স্থানকে মুক্ত করতে হবে। দেশে ফিরে তিনি এসব কথা প্রচার করলে বহু লোক দলে দলে যোগদান করল। পিটার হাজার হাজার সঙ্গী নিয়ে ধর্মযুদ্ধে যাত্রা করলেন। 'পেনিলেস' অর্থাৎ কপর্দকশূন্য **ওয়ালটার** নামক এক নাইট তার অনুচর হলেন, কিন্তু

অশিক্ষিত জনতা যুদ্ধের কিছুই জানে না। দু হাজার মাইল পথ পেরিয়ে যখন তারা পবিত্র ভূমিতে পৌঁছাল, তুর্কীরা তাদের সহজেই হারিয়ে দিল। অবশ্য আসল বাহিনীর

যোদ্ধা সামন্তরা জেরুসালেম অধিকার করে সেখানে খৃষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা (১০৯৯ খৃঃ) করেন। প্রথম ক্রুসেডই সব চেয়ে সফল অভিযান। পরে অবশ্য জেরুসালেম ফের মুসলমানদের হাতে চলে যায়।

তৃতীয় অভিযান ও প্রথম রিচার্ড ঃ তৃতীয় অভিযানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইবার অনেক বড় রাজা দল বেঁধে ক্রুসেডে যোগদান করলেন। ফ্রান্সের রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** ইংলণ্ডের রাজা **প্রথম রিচার্ড** আর সম্রাট **ফ্রেডরিক** এই দলে ছিলেন। রিচার্ড বড় বীর ছিলেন বলে জীবনের বেশীর ভাগ সময় দেশের বাইরে কাটিয়েছিলেন। অত্যন্ত সাহসী পুরুষ বলে তাঁর নাম দেওয়া হয় 'সিংহবিক্রম রিচার্ড'। বহুদিন রাজ্যে অনুপস্থিত থাকায় রিচার্ডের ছোট ভাই জন ইংলণ্ডে সর্বেসর্বা হয়ে প্রজাদের অতিষ্ঠ করে তোলেন। এই সময়েই নাকি **রবিনহুড** শেরউড জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে বড়লোকদের টাকাকড়ি লুটপাট করতেন এবং তার অনেক অংশ দরিদ্রদের বিলিয়ে দিতেন। রবিনহুড ও তাঁর দস্যুদল সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। যাই হোক, দুই রাজা, রিচার্ড ও ফিলিপ একসঙ্গে যাত্রা করেন। তাঁদের কিছু আগে সম্রাট ফ্রেডরিক বেরিয়েছিলেন। তাঁর দাড়ির রং লাল ছিল বলে তাঁকে ফ্রেডরিক 'বার্বারোসা' বলা হত। প্যালেস্টাইন পৌঁছবার আগে তিনি জলে ডুবে মারা যান। তাঁর সৈন্যবাহিনীও 'সারাসেন' মুসলমান শত্রুর হাতে পড়ে বিধ্বস্ত হয় এবং বহু জার্মান সৈন্য ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এদিকে রিচার্ড ও ফিলিপের মধ্যে বিবাদ বাধল। ফিলিপ চলে আসলে, রিচার্ড একাই যুদ্ধ

করতে লাগলেন। তাঁর সাহস ও বীরত্বের কাহিনী সমগ্র সভ্য জগতে ছড়িয়ে পড়ল। জেরুসালেম দখল করতে তিনি পারেন নি, কিন্তু মুসলমান রাজা **সালাদিন** তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন।

চতুর্থ অভিযান ঃ এই অভিযান এক কলঙ্কময় কাহিনী। এর মধ্যে না ছিল ধর্মভাব, না ছিল শত্রুর সঙ্গে প্রকৃত যুদ্ধ। ধর্মযোদ্ধারা হল্যাণ্ড ফ্রান্স ভিনিস প্রভৃতি জায়গা থেকে জড় হল কিন্তু কনস্ট্যাণ্টিনোপল পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবিলা হল না, গন্তব্য স্থল প্যালেস্টাইনে যাওয়াই হ'ল না, জেহাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হল না। তার বদলে যোদ্ধারা খৃষ্টান রাজ্য হাঙ্গেরি আক্রমণ করল, আর পূর্ব সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যময় রাজধানী কনস্ট্যাণ্টিনোপল দুইবার অবরোধ করে শহরটিকে বিধ্বস্ত করে দিল। তিন দিন ধরে তারা প্রচুর জিনিস লুট করে অনেক গির্জা অমূল্য শিল্পসম্পদ ধ্বংস করে ফেলে। সেখানকার গ্রীক খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য সরিয়ে এক ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত হল। কিন্তু ষাট বছরের মধ্যেই পূর্ব সম্রাটরা কনস্ট্যাণ্টিনোপলে আবার ফিরে এলেন। টাকা পয়সার লোভ, স্বার্থপরতা, নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার, খ্রীষ্টান হয়ে খ্রীষ্টানদের আক্রমণ, এই অভিসন্ধি আর কার্যকলাপ থেকে প্রমাণ হয় যে চতুর্থ অভিযানটি শুধু অসার্থক নয়, নিতান্ত অগৌরবের।

আর একটি ক্রুসেডের কাহিনী বড় করুণ। এটিকে 'শিশুদের ক্রুসেড' বলা হয়। এক অনভিজ্ঞ তরুণের নেতৃত্বে হাজার হাজার ছোট ছেলে, স্ত্রীলোক ও দরিদ্র কৃষক এই অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। পথঘাট জানা ছিল না বলে তারা খুব বিপদে পড়ে। দুজন শয়তান ব্যবসায়ী বালকদের ভুলিয়ে জাহাজে করে উত্তর আফ্রিকায় নিয়ে যায় ও সেখানে ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রী করে দেয়। অধিকাংশ ছেলেরা আর ফিরতে পারেনি, অনেকেই পথকষ্টে মারা পড়ে। শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডের উদ্দেশ্য সফল হয় নি। জেরুসালেমের খ্রীষ্টান-রাজ্য প্রায়' একশ' বছর খ্রীষ্টান অধিকারে ছিল। কিন্তু ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সালাদিন তা আবার মুসলমান দখলে আনেন। সালাদিন আশ্চর্য যোদ্ধা ছিলেন। য়ুরোপের বড় বড় রাজারা তাঁর সঙ্গে যুঝতে পারেননি। খ্রীষ্টান যোদ্ধাদের মত তিনিও মুসলিম ধর্মযুদ্ধ ভেবে প্রাণপণে সংগ্রাম করেন।

ফলাফল ঃ ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুসেড শেষ হল। প্রায় একশ বছর যুদ্ধ করেও জেরুসালেম শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের দখলে এল না। খ্রীষ্টানরা শুধু যীশুর সমাধি দেখতে আসার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু নিষ্ফল হলেও ইতিহাসে ক্রুসেডের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ক্রুসেডে যাঁরা যোগদান করেছিলেন, সকলেই ধর্মভীরু ছিলেন না। অনেকেই অর্থের লোভে এ যুদ্ধে নেমেছিল, কেউ বা হুজুগের বশে ক্রুসেডে গিয়েছিল। এ ছাড়া ভবঘুরে পলাতক লোকও এসে জুটেছিল। অন্যদিকে য়ুরোপের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। যোদ্ধারা যে পথ দিয়ে যেত, সেই পথের ধারে রসদ জোগাবার জন্য মেলা ও বাজার বসে যেত। তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে লোকের নজর আকৃষ্ট হল। কারণ

চাহিদার ফলে এখানে অনেক রকম হাতের তৈরী জিনিস বিক্রী হত। তার ফলে কুটির শিল্পের উন্নতি হতে থাকল এবং কৃষি-শিল্প ক্রমে সরে এসে একটি আলাদা শ্রমের ক্ষেত্র সৃষ্টি হল। বাজার ও মেলাগুলি স্থায়ী ও বড় হয়ে নতুন নতুন নগর পত্তন করল। ইটালিতে **ভিনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স** প্রভৃতি শহরগুলি এই ভাবে বাণিজ্যের দৌলতে খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ প্রাচ্য দেশ থেকে চিনি খেজুর কর্পূর মৃগনাভি হাতির দাঁতের তৈরী জিনিস, সুতি রেশম গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি নানা নতুন সওদা য়ুরোপে আমদানি হতে থাকে। তারপর, ভারত আরব প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানও য়ুরোপে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে ক্রুসেডের সময় লোকের ধর্মভাব বেড়ে যাওয়ায় খৃষ্টান জগতে ধর্মগুরু পোপের প্রতিপত্তিও বাড়তে লাগল। সুতরাং ক্রুসেডের সঙ্গে মধ্যযুগের সভ্যতার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তবে ক্রুসেডের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হল যে সামন্ত প্রথার দিন শেষ হতে চলল। অভিজাত 'লর্ডরা' তাদের অনেক জমিজমা ও স্বত্ব-দাবি বিক্রী করে দিয়ে ক্রুসেডে যাওয়ার অর্থ জোগাড় করল। আর বহু চাষী ও নিম্নস্তরের মানুষ মাটি ছেড়ে মজুর বনতে লাগল। স্থলপথে যাত্রীদের জন্য রাস্তা বানানো, জলপথের জন্য জাহাজ তৈরীর কাজে শ্রমিকদের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে কৃষকরা স্বাধীন কাজ পেয়ে গেল। এই থেকে ভূমিদাস ও ক্রীতদাসের মুক্তির পথ প্রশস্ত হল। এই রকম নতুন স্বাধীন জীবিকার সুযোগ আসতে মনিবের দয়া-নির্ভর, জমির সঙ্গে বাঁধা সামন্ত প্রথার অবসানের সূচনা হল। দেখা যাচ্ছে, ধর্মযুদ্ধের সংঘাতে য়ুরোপের ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সুরু হল।

অনুশীলনী

১। ধর্মযুদ্ধের ফলাফলগুলি অল্প কথায় বুঝিয়ে দাও।
২। সামন্ত প্রথার দিন শেষ হয়ে এল কেন, ও কি ভাবে।

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১। ক্রুসেড' কথাটির কি মানে? ২। কয়টি অভিযান হয়েছিল? ৩। যুদ্ধরত দুই পক্ষের নাম বল। ৪? সন্ন্যাসী পিটার কি করেছিলেন? ৫। 'পেনিলেস' নাম দেওয়া হয়েছিল কাকে? ৬। 'পবিত্র ভূমি' কোনটি? ৭। খ্রীষ্টানদের কাছে সেরা তীর্থ শহরের নাম কি? খ্রীষ্টান রাজ্য কোথায় স্থাপিত হয়? সেটি কি স্থায়ী হয়েছিল? ৯। তৃতীয় অভিযানের নায়কদের নাম বল। ১০। 'বার্বারোসা' নামকরণ হল কেন? ১১। চতুর্থ অভিযান কেন অগৌরবের?

নবম অধ্যায়
মধ্যযুগের নগর

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
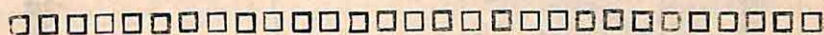
উৎপত্তি ঃ মধ্যযুগে য়ুরোপের নানা জায়গায় নগর প্রতিষ্ঠা হয়। কিভাবে নগরগুলির সৃষ্টি হয়, তা অষ্টম অধ্যায়ে কিছু কিছু বলা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন নগরের উৎপত্তি হয় ক্রুসেড উপলক্ষে যুদ্ধ বা ঘরোয়া বিবাদের জন্য রাজাদের ও লর্ডদের অর্থের প্রয়োজন পূরণ করে কিছু নগর তাদের স্বাধীনতা কিনে নেয় এবং স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। বণিক-ব্যবসায়ী দলের হাতে তখন টাকাকড়ি আসছে, কাজেই অর্থের বদলে রাজা তাদের সনদ দিতে বাধ্য হন। ব্যারন বা লর্ডরাও তাঁদের এলাকায় নগর-বণিকদের অনেক শর্ত সুবিধা মেনে নিলেন। সুতরাং বাণিজ্য বৃদ্ধি, বণিক ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধি, নতুন শ্রেণীর শিল্পী কারিগরদের আবির্ভাব—এইসব কারণে নগরের উৎপত্তি হয়েছিল। স্থল ও জল বাণিজ্যের পথগুলির পাশে নগরগুলির অবস্থান মানচিত্রে দেখানো হনেছে। তা থেকে বোঝা যাবে ঐ সব জায়গায় নতুন শহরের জন্ম হল কেন। অবশ্য রোমানদের সময় থেকেই নগরের সৃষ্টি হয়, মধ্যযুগে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গোড়ার দিকে সাধারণতঃ এই শহরগুলি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের 'কাস্‌ল', বা দুর্গ-প্রাসাদের আশেপাশে অথবা কোন বড় মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। রাজকীয় সনদ পেয়ে অনেক নগর স্বয়ংশাসিত হয়।

নগর জীবন ঃ আজকালের শহরের চেয়ে অবশ্য এগুলি অনেক ছোট, কিন্তু অনেক লোক ঘেঁষাঘেষি করে বাস করত। বাড়িগুলির শ্রী-ছাঁদ ছিল না। মধ্যযুগের নগরবাসীরা যে খুব সুখে থাকত, তা নয়। প্রথমতঃ পথ-ঘাট সরু ও পাথর বাঁধানো। রাস্তাগুলি অনেক সময়ে পিছল ও আবর্জনায় পূর্ণ থাকত। পথে কুকুর ও শুয়োরের দল ঘুরছে, উপরের জানালা থেকে গৃহস্থ পথিকদের গায়ে ময়লা জল ফেলেছে, এই দৃশ্য বিচিত্র নয়। তারপর অন্য অসুবিধাও ছিল। বেশির ভাগই কাঠের বাড়ি, ফলে আগুন লাগার ভয় অথচ জলের বন্দোবস্তও ভাল ছিল না। ভ্রাম্যমান বণিকদল 'টোল' বা ট্যাক্স না দিয়ে ঢুকতে পেত না। এক শহর থেকে আর এক শহরে মালপত্র নিয়ে যেতে হলে কিংবা দোকানে জিনিস মেলে রাখতে গেলেও নানা রকমের শুল্ক লাগত।

নগরগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বেশীর ভাগই রাজকীয় সনদের জোরে। যেসব নগরে পৌরসভা ও নিজস্ব শাসন আছে, তাদের 'বরো' বা 'বুর্গ' বলা হয়। তাই থেকে 'বুর্জোয়া' শব্দটি এসেছে। উচ্চ ও নিম্ন-শ্রেণীর মাঝামাঝি অর্থাৎ বণিক ব্যবসায়ী শিল্পী প্রভৃতি লোকদের নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বুর্জোয়া বলা হয়। একজন মেয়রের জনকয়েক সহকারী নিয়ে নগর শাসন করতেন। এই সব নগরে যারা বার্তাবাহক, তারা হাঁক দিয়ে

মধ্যযুগের শহর
কিলোমিটার
০ ৪০০ ৮০০
আটলান্টিক
মহাসাগর।
লণ্ডন
আমস্টার্ডাম
হামবুর্গ
মস্কো
ভিয়েনা
ভেনিস
লিসবন
রোম
নেপলস্
কনস্টান্টিনোপল
বাগদাদ
ত্রিপলী
আলেকজান্দ্রিয়া
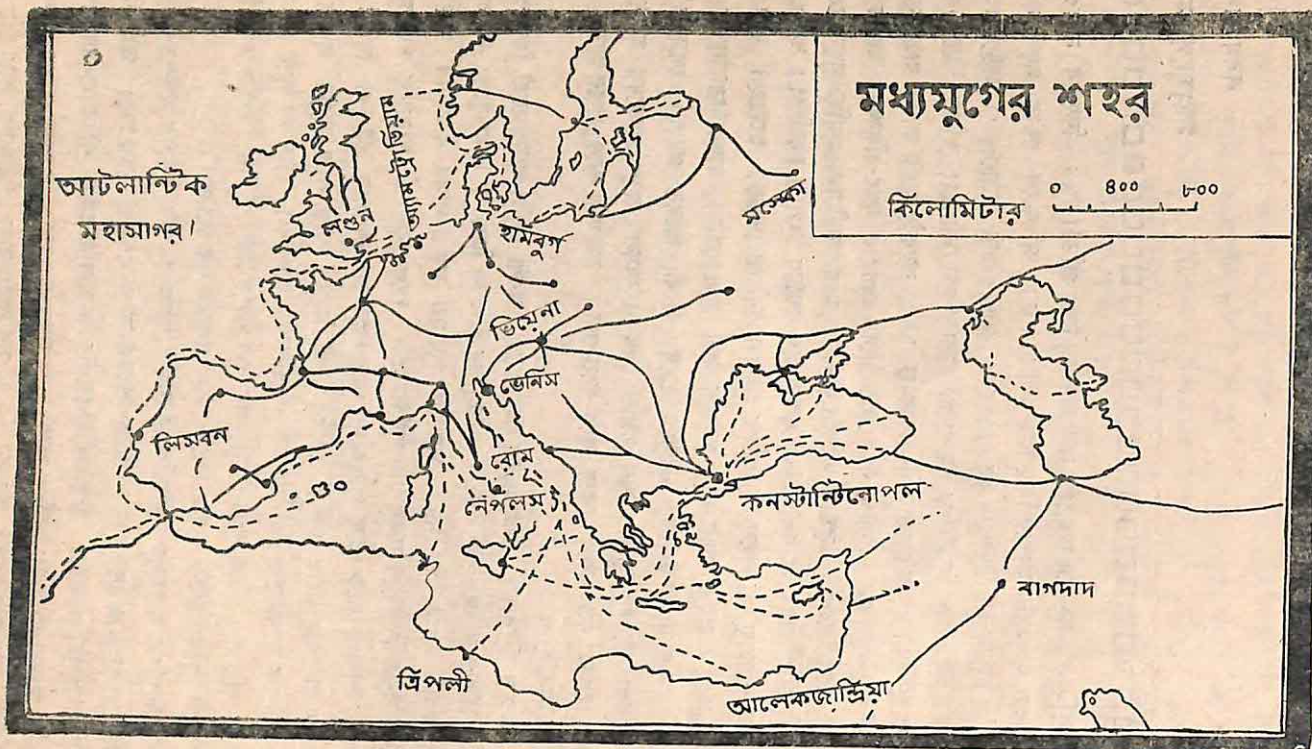
লোক ডাকত, সদর বাজারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জরুরী খবর শোনাত। প্রতি শহরেই একটি বড় গির্জা আর বাজার ছিল। ছুটির দিনে বা কাজ না থাকলে নগরবাসীরা ঐখানে একত্র হত। দোকানপাট ছিল বটে তবে আজকালের মত মালপত্র ভালভাবে সাজানো থাকত না। দরজার সামনে তক্তায় সওদার জিনিস মেলে রেখে দোকানদার ঘরের ভিতরে নিজের কাজ করত। দোকানের সামনে উপর থেকে একটা কাঠের ফলক ঝুলত, যে জিনিসের দোকান, তারই একটা ছবি অাঁকা। এক একটি রাস্তায় এক এক ধরনের জিনিস পাওয়া যেত। সাধারণতঃ শহরে যে সব মাল তৈরী হত, তাই নিয়েই ব্যবসা চলত। বাইরের জিনিস আমদানি করলেই তো শুল্ক লাগবে।
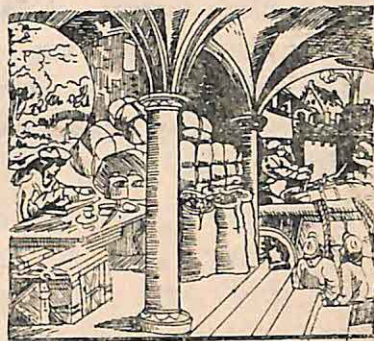
মধ্যযুগের দোকান ও দোকানদার

গিল্ড ঃ যারা কারিগর, তাদের নিজস্ব সংঘ ছিল। ছুতার, কামার, স্যাকরা, রাজমিস্ত্রী সকলেরই আলাদা আলাদা 'গিলড' বা সংঘ ছিল। শ্রমশিল্পীদের এই 'গিল্ড'গুলি ভালোভাবে কাজ করত। কোন কারিগর মারা গেলে বা অসুস্থ হলে গরীব পরিবারকে সাহায্য করা হত সংঘের পুঁজি থেকে। গির্জা বা বিদ্যালয় তৈরি করবার সময় তারা চাঁদাও দিত। প্রতি গিল্ডেরই নিজস্ব আইন-কানুন ছিল। অসাধু উপায়ে ব্যবসা করা চলত না, পাছে সংঘের বদনাম হয়। পরিশ্রমের বেতন, সময়, সবই নির্ধারিত ছিল। শঠতা করলে শাস্তি দেওয়া হত। হয়তো রুটিওয়ালা ওজনে কম রুটি দিয়েছে, শাস্তি হল গলায় রুটির মালা পরিয়ে রাস্তায় তাকে টেনে ঘোরানো হবে। এ ছাড়া অধিকাংশ ব্যবসায়ে কাজ শেখাবার জন্য 'এপ্রেণ্টিস' বা 'নবিস' নেওয়া হত। এরা শিক্ষানবিশ, 'মাস্টার' বা ওস্তাদের কাছে কাজ শিখত। বেশীর ভাগ কাজে তিন বছর লাগত। সোনা-রুপার কাজ শিখতে হলে, দশ বছর। শিক্ষানবিশরা বেতন পেত না, ওস্তাদের কাছে থেকে খেয়ে কারিগরি শিখত, দোকানের মালও বেচত। তারপর শেখার কাজ শেষ হলে কাজের নমুনা দেখিয়ে পরীক্ষা দিতে হত। কারিগরের শ্রেষ্ঠ নমুনাকে বলা হত **'মাস্টারপিস'**।

ব্যবসায়ীদেরও সংঘ ছিল। নগরের শিল্পী ও বণিকদল যৌথজীবন যাপন করত বলে সংঘবদ্ধ নগরগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে যে সব শহর বড় ও সমৃদ্ধ হয়, তাদের মধ্যে **অ্যাণ্টওয়ার্প, অ্যামাল্‌ফি, কলোন, জোনোয়া, ভিনিস** প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। এইসব নগরে একটি একটি করে গিল্ড-হল্ থাকত, সেখানে

বিভিন্ন শ্রেণী ও সংঘ একত্র মিলত। এই থেকেই 'টাউন হল' বা নগরের সভাঘর কথার উৎপত্তি। কালক্রমে শহরগুলির প্রতিপত্তি এতটা বাড়ল যে তারা স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র রূপে নিজেরাই শাসনব্যবস্থা চালাত। কোন কোন নগরে একটি বিত্তশালী পরিবার রাজবংশের মত ক্ষমতা অধিকার করে বসত। ইটালিতে, বিশেষ করে **ফ্লোরেন্স ও মিলান** শহরে এই রকম ঘটেছিল। রেনেশাঁস যুগে শাসকদের আনুকূল্যে ঐ সব নগররাষ্ট্রে শিল্পচর্চায় এতই উন্নতি হয় যে আজও তা বিশ্ববিখ্যাত। মধ্যযুগে ভিনিস শহরের যে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি হয়েছিল, তা সামুদ্রিক বাণিজ্যের দৌলতে। সমগ্র ভূমধ্যসাগরের সাম্রাজ্ঞীরূপে ছিল ভিনিসের খ্যাতি।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগে য়ুরোপের কয়েকটি শহরের নাম বল।
২। রাজারা নগরবাসীদের সনদ দিতেন কেন?
৩। ব্যারন ও জমিদারদের টাকাকড়ি জোগাড় করা দরকার হয়েছিল কেন?
৪। 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে নগর উৎপত্তির কি সম্বন্ধ?
৫। মানচিত্র থেকে কয়েকটি বাণিজ্যপথ দেখাও।
৬। ভিনিস কোথায় অবস্থিত? তার খ্যাতি কি হিসাবে?
৭। নগর কি ভাবে শাসিত হত? নগরগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ কি?
৮। নগরবাসীদের জীবন কেমন ছিল, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৯। 'গিল্ড' কাকে বলে? কয়েকটি গিল্ড উল্লেখ কর। তাদের কি রকম নিয়ম-কানুন ছিল?
১০। শিল্প-কারিগররা কি শিখত, কি ভাবে থাকত, অল্প কথায় বল।
১১। বুর্জোয়া কথাটি কোথা থেকে এল? তার মানে কি?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) যে সব নগরে পৌরসভা ও নিজস্ব শাসন আছে, তাদের —— বা —— বলা হয়। তাই থেকে —— শব্দটি এসেছে।
(খ) কারিগরের শ্রেষ্ঠ নমুনাকে বলা হত ——।
(গ) সমগ্র ভূমধ্যসাগরের সম্রাজ্ঞী রূপে ছিল —— খ্যাতি।

দশম অধ্যায়

মধ্য যুগে সুদূর প্রাচ্য

চীনের মধ্য যুগ ঃ (সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতক) ঃ

সব দেশে মধ্য যুগ যে এক ধরনের বা একই সময়ে সুরু নয়, সে কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। খ্রীষ্ট জন্মাবার পাঁচশো বছর আগেও সুদূর প্রাচ্যে চীনে মধ্য যুগ অর্থাৎ সামন্ত-যুগের লক্ষণ দেখা যায়, ঐতিহাসিকরা বলেন। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে বা প্রদেশে বড় বড় লর্ড, সামন্ত ও অনুচর বাহিনী নিয়ে, রাজত্ব করতেন। যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত এবং প্রদেশগুলিও প্রায়ই হাত-বদল হত। তারই মধ্যে কয়েকটি রাজবংশ তাঁদের সাম্রাজ্য গড়ে শাসন দৃঢ় করেন। কিন্তু সামন্ত প্রভুদের চক্রান্তে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিত! তবে উপর তলায় যাই হোক, নীচের তলায় বিশেষ হত না। চীন দেশের আয়তন তো কম নয়, ছোট খাটো মহাদেশ বলা চলে। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের অগণিত কৃষকরা শত নিপীড়নের মধ্যেও তাদের কাজ করে যেতো। কারিগরদের শিল্পকাজও নষ্ট হয়ে যায় নি। মনে রেখো, ভারতের মতো চীনও কৃষিনির্ভর দেশ, জমি চাষ ও ফসল উৎপাদনই প্রধান জীবিকা। সেই প্রাচীন শাং রাজবংশের আমল থেকে চীনে জমিচাষের প্রথা ও সেচ-পদ্ধতি চলে এসেছে। সেকালে জমিগুলি এইভাবে গ্রামের আটটি পরিবারের মধ্যে বিলি করা হত ঃ

১	২	৩
৪	৯	৫
৬	৭	৮

এর নাম মৌ প্রথা। প্রায় ১১ একর জমি নিয়ে এক একটি খণ্ড প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া হত। মাঝের নবম খণ্ডটি সর্ব-সাধারণের। গ্রামের সব লোক সেটি চাষ করে উৎপন্ন ফসল দিত খাজনা হিসাবে।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, চীনে তখন বিখ্যাত তাং বংশের আমল। হর্ষবর্ধন যখন ভারতে রাজত্ব করছেন, চীনে তখন এক বিশিষ্ট যুগের সূত্রপাত ও নতুন সাম্রাজ্যের উদয় হয়। চীনে তখন উপজাতিদের উপদ্রব, দেশও কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত। এই অবস্থায় লি য়ুয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ রাজ্যের পত্তন করেন এবং

দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। এই রাজ্যটিকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন তাঁর ছেলে তাই-সুং, যিনি শাসন-দক্ষতার জন্য চীনের ও পৃথিবীর ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে খ্যাত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাং সাম্রাজ্য প্রায় তিনশো বছর টিঁকেছিল।

তাই-সুং ঃ তাই সুং চীনের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য নানা সংগঠন কাজে হাত দেন। তাতার প্রভৃতি হানাদার শত্রুদের বিতাড়িত করে তিনি দেশকে নিরাপদ করলেন, গৃহযুদ্ধে বিভক্ত চীনকে একত্র ও দৃঢ়বদ্ধ করলেন। প্রশাসন ব্যবস্থার গুণে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কার্যকর হল। তাং সাম্রাজ্যের আয়তনও ছিল খুব বড়। উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে চীনের বৃহৎ প্রাচীরের ওপারে গোবি মরুভূমি, পশ্চিমে তুর্কিস্তান পার হয়ে পারস্যের সীমান্ত আর কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্যের এলাকা ছিল বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইসব অঞ্চল প্রত্যক্ষ চীন শাসনের অধীন ছিল কি না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। কেউ কেউ বলেন, রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে আরও বড় ছিল তাং সাম্রাজ্যের বিস্তার।

তাই সুং-এর শাসনকালে চীন দেশে বিদ্যা ও শিল্প চর্চার বিশেষ উন্নতি হয়। রাজধানী সিয়ান শহরের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিদেশী এখানে আসতেন। এসিয়ার বিভিন্ন দেশ, এমন কি য়ুরোপ থেকেও নাকি রাজদূত এসেছিলেন। হর্ষবর্ধনও চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। এই সব কারণে তাই সুং-এর এত খ্যাতি হয়েছিল। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী চাংসুন ছিলেন তাঁর উপযুক্ত রানী। তাই-সুং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বন্ধ করেন। তিনি নাকি বলতেন, চুরি বন্ধ করতে হলে আগে ভালোভাবে দেশ শাসন করা উচিত। খাওয়া-পরার ভাবনা না থাকলে লোকে আর চুরি করবে না। ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাঁর সভায় জরথুস্ট্র ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও মুসলিম ধর্মের প্রচারক সকলেই সমান অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। তাঁর সময়েই চীনে প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয় ক্যান্টন শহরে, তা আজও বর্তমান। এই সব কারণে চীনাদের মতে তাই-সুং-এর মতো গুণবান সম্রাট তাদের দেশে আর কেউ হন নি।

তাং যুগের সভ্যতা ঃ (৬১৮-৯০৭ খ্রী ঃ) ঃ তাই সুং-এর রাজত্বকালে শিক্ষার বহুল প্রসার হয়েছিল। ভারতের গুপ্ত সম্রাটদের মত তিনিও শিল্পী এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের উৎসাহ ও সাহায্য দিতেন। ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চায় তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। রাজধানীতে ছয়টি বিদ্যাপীঠে হাজার হাজার ছাত্র ইতিহাস, আইন, প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় পাঠ নিত এবং তিব্বত, কোরিয়া জাপান থেকেও শিক্ষার্থীরা আসত চীনা সংস্কৃতি জানতে ও বুঝতে। পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিও চালু ছিল।

তাং-রাজবংশের খ্যাতির প্রধান কারণ, এ যুগে শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে চীনের বিস্ময়কর উন্নতি হয়। বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার আইন সংকলন, যার নাম 'তাও কোড'। নানা বিষয় সংক্রান্ত দেশের আইনগুলি একত্র বিধিবদ্ধ করে

টীকা ও ব্যাখ্যা সমেত এই 'কোড' চালু হয় সম্রাট তাং-এর মৃত্যুর ঠিক পরেই। সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে অসংখ্য পুঁথিপত্র ছিল। তার মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের অনেক পুঁথি হিউয়েন সাঙ ভারত থেকে স্বদেশে নিয়ে যান। সম্রাটের অনুরোধেই হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ফলে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি সুরু হলেও তাং রাজাদের উৎসাহে ও আগ্রহেই চীনে তার রক্ষণ ও প্রসার সম্ভব হয় এবং চীন ও ভারতের মধ্যে শিল্প, ধর্ম ও সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। চীনারা এই যুগেই প্রথম বারুদ আবিষ্কার করে এবং ছাপার কাজ প্রবর্তন করে। আগে কাঠের হরফে, তারপর ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে, ভাল অক্ষরে মুদ্রণ সুরু হল। ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সবচেয়ে পুরানো গ্রন্থ একখানি বৌদ্ধ ধর্মসূত্র মুদ্রিত হয়েছিল।

চীনা বয়নশিল্প—সোনার জরি দেওয়া তিন রঙা ফুলতোলা ভেলভেট

তাং যুগে চীনের নামকরা দার্শনিক ও সাহিত্যরসিক হান উ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে পণ্ডিতরা খুব শ্রদ্ধা করতেন। জাং-জি-হো নামে আর এক বড় ভাবুক ছিলেন। তিনি নদীর ধারে বিনা টোপে মাছ ধরতে গিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকতেন। সে-যুগে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন লি বো। তাঁর প্রকৃতি খুব সরল ও স্ফূর্তিপ্রিয় ছিল। শোনা যায়, জলের মধ্যে চাঁদ ধরার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরম বন্ধু তু ফু ছিলেন আর এক মস্ত কবি।

চীনের সৌন্দর্য প্রীতি অসাধারণ। বহুমূল্য মনিমুক্তার সংগ্রহ, ছবি আঁকা, মাটি বা পোর্সিলেনের পাত্র তৈরী করে তাতে বিচিত্র চিত্র রচনা করা—এই সমস্ত শিল্পে তাং যুগে চীনারা অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। চীনে পাণ্ডিত্যের খুব

সমাদর করা হত। **'মান্দারিন'** বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা লেখাপড়া নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে সরকারী কাজে মন দেবার অবকাশ পেতাম না। তা ছাড়া নৌবিদ্যা এবং ব্যবসাবাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাং রাজাদের সময়ে সুদক্ষ চীনা নাবিকরা 'জাঙ্ক' নামে ছোট ছোট জাহাজে ভারত মহাসাগর দিয়ে সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে পণ্য দ্রব্য নিয়ে ঘুরত। শুধু জলপথে নয়, গ্রেট সিল্ক র‍্যুট' বা রেশম বহনের পথ দিয়েও চীন-ভারত কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলের অনেক সওদা সামগ্রী যেত আসত। এই বাণিজ্য-বৃদ্ধির ফলে দেশে যথেষ্ট অর্থাগম হত এবং তারই জন্য শিল্প ও সভ্যতার এত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

চীনা শিল্পের নমুনা—তিন রঙা পালিশ করা পাথরের ডিশ

সভ্যতায় চীনের দুটি বড় দান, চা ও রেশম। চীনের রেশম ও চায়ের কদর ছিল সারা জগতে, এখনও আছে। চায়ের স্বাদ ও গন্ধ এবং তৈরি করার প্রণালী নিয়ে চীনে একাধিক বই লেখা হয়। সে যুগে খাদ্যদ্রব্য, রেশমী কাপড় আর পশুর লোমে প্রস্তুত শীতবস্ত্র, কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু চীনের কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি। তাং যুগে সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধি বাড়লে কি হয়, সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণীদের চাপে সঙ্গীতহীন ভূমিজীবী মানুষরা অনেক পরিশ্রম করেও কোন রকমে দিন গুজরান করত। যাই হোক, চীনারা পূর্ব স্মৃতি নিয়ে গৌরব করে বলতেন 'আমরা তাং-এর দেশের মানুষ'। সত্যই তাই। চীনের সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্ম সুদূর প্রাচ্যের সব দেশে প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে জাপান, কোরিয়া ও আনামে। চীনের সংস্কৃতি একদা অনুকরণীয় আদর্শ বলে গণ্য হত।

সুং আমল ঃ (৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ) সুং বংশের শাসনকালে চীনের উন্নতি অব্যাহত ছিল। তাং রাজত্বের অবসানে সাময়িক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কিন্তু সুং রাজারা আবার শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কর্মপটু দক্ষ শাসক ছিলেক **ওয়াং আন-শি**; প্রশাসনের কাজে তার রক্ষনশীল নতুন ও অনেকটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। পুরাতনপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি এমন কয়েকটি সংস্কার চালু করেন যার মধ্যে জাতীয় সমাজতন্ত্রের আভাস দেখা যায়, পণ্ডিতরা এ কথা বলেন। জনগণের সুবিধা-স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করেন। কৃষি-ঋণ দান, খাজনা হিসাবে শস্যের ভাগ দেওয়ার প্রথা, শিল্প-বাণিজ্যকে রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা, আদম সুমারী প্রচলন, সম্পত্তির উপর কর ও আয় অনুসারে আয়কর ধার্য করা, যুদ্ধের জন্য ঘোড়া সরবরাহ

ব্যবস্থা—এই সবই তাঁর কৃতিত্ব। এ ছাড়া সেনাবাহিনী ও শাসন দপ্তরগুলির ব্যাপক সংস্কার তাঁর আর একটি বড় কাজ এই সবের জন্য বিভিন্ন বোর্ড ছিল।

সুং আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রাজারা সেই কারণে ইয়াংসি নদীর উর্বর অঞ্চলে চাষ-জমির আয়তন বাড়াবার জন্য সেচকর্মের ভালো ব্যবস্থা করেন। কৃষকরা পরিশ্রম করে, ধানের নতুন বীজ লাগিয়ে এবং গম ধান ও সবজির চাষ করে এই সময়ে দুনো ফসল উৎপন্ন করত। শ্রম-শিল্পের প্রসারও এই যুগে লক্ষণীয়। নানা শ্রেণীর কারিগর কাঠ, ইঁট, গলানো লোহা ও ধাতুর মিশ্রণ দিয়ে অনেক রকম জিনিস প্রস্তুত করত। সুং আমলের তিনটি বৈশিষ্ট্য, স্থাপত্য (বাড়ীঘর প্রাসাদ নির্মাণ) **পর্সিলেন** শিল্পের অভিনব বিকাশ এবং মুদ্রণ ও কাগজের টাকা প্রচলন। এ ছাড়া সূক্ষ্ম শিল্পকলারও নতুন রূপ দেখা যায়, বিশেষ করে **চিত্রাঙ্কন** শিল্পের। চীনের চিত্রশিল্পীরা প্রকৃতিকে যেভাবে এঁকেছেন,—সবল কয়েকটি রেখায় জীবন্ত ঘোড়ার উদ্দাম গতি, প্রস্ফুটিত ফুলের, ঋজু গাছের আনত শাখার বা ঝরণার সুকুমার সৌন্দর্য ফুটিয়েছিলেন, অন্যত্র কোথাও সেই রীতির চর্চা হয়নি। গোল করে পাকানো বাঁশ থেকে তৈরী কাগজে কিংবা রেশমের উপর তাঁরা চিকণ তুলি বুলিয়ে যেতেন। হাতের লেখাও ছিল ঐ রকম। চীনা হস্তলিপি আর চিত্রলিপি দেখলেই পরস্পরের সাদৃশ্য ও নিকট সম্বন্ধ বোঝা যায়।

চীনা ভাস্কর্য—পোর্সিলেনে তৈরী অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি

এ যুগের বিজ্ঞানের চর্চাও খুব এগিয়েছিল, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যায়। দিকনির্ণয়ের যন্ত্র (কম্পাস), আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য উপযোগী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রচালিত ঘড়ি, এগুলি এই আমলের আবিষ্কার। ভূগোলবিদ্যায় ও মানচিত্র তৈরী করায় চীনারা পারদর্শী হয়ে ওঠে। মোট কথা, জীবনের প্রত্যেক দিকেই চীনাদের প্রচেষ্টা ও আগ্রহ ছিল প্রচুর। বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে মধ্য যুগে অন্যান্য দেশের তুলনায় তারা অনেক বেশী দক্ষতা, বাস্তব বুদ্ধি ও উদ্ভাবন শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু তাং ও সুং আমলের গৌরব অস্তমিত হল মধ্য এসিয়া থেকে মোঙ্গল-তাতারদের আক্রমণে।

মোঙ্গলদের কথা, চিঙ্গিজ খাঁ ঃ মোঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত চিঙ্গিজ খাঁ নামে এক সাহসী বীর সভ্য জগৎ বিধ্বস্ত করে এক বিরাট রাজত্ব স্থাপন করেন। এই দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির

আদি নিবাস ছিল মধ্য এসিয়ার তুর্কীস্থান ও উত্তর এসিয়ার কোন কোন অঞ্চলে। খ্রীষ্টীয় তেরো শতকে তুর্কীদের মত তারাও পশুপালন করত এবং যাযাবর ছিল। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে নানাদেশে ঘুরে বেড়াত এবং বেশীর ভাগ সময় তাঁবুতে বাস করত। তাদের প্রধান কাজ ছিল শিকার ও যুদ্ধ ব্যাপারে তারা অসীম সাহসী ও তীর ধনুকের ব্যবহারে অতি নিপুণ ছিল। ঘোড়-সওয়ার আর তীরন্দাজ, এরাই মোঙ্গল সৈন্যের প্রধান বল। চিঙ্গিজ খাঁ একটি সুশিক্ষিত মোঙ্গল বাহিনীর সাহায্যে নানাস্থানে অভিযান চালান এবং বহু দেশ জয় করেন। অনেক জনপূর্ণ নগর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল তাঁর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অজস্র নরহত্যা ও ধ্বংসের কারণ বলে চিঙ্গিজ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

চীনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে তিনি উত্তর চীনে অভিযান চালান এবং ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং দখল করেন। তারপর তুর্কী সাম্রাজ্য আক্রমণ করে সমরকন্দ জয় করেন। ক্রমে কাশগড় বোখারা এবং পারস্যও মোঙ্গলদের অধীনে আসে। চিঙ্গিজ খাঁ সসৈন্যে ভারতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু চলে যান। দিল্লীর সুলতানরা আবার মোঙ্গল আক্রমণে খুব বিব্রত হয়েছিলেন। চিঙ্গিজ খাঁর লুটপাট, রক্তপাত ও অত্যাচারের অনেক কাহিনী আছে। চিঙ্গিজের অভিযানের ফলে চীনের কিছু অংশ, পশ্চিম তুর্কিস্তান পারস্য, আর্মেনিয়া ও লাহোর পর্যন্ত ভারতের অংশ এবং দক্ষিণ রাশিয়া আর পশ্চিমে হাঙ্গেরী তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। নিষ্ঠুর হলেও চিঙ্গিজ নিতান্ত বর্বর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাহিত্যমোদী ছিলেন স্বয়ং কবিতা রচনা করতেন। **চুসাই** নামে তাঁর একজন বিজ্ঞ চীনদেশীয় মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই পরামর্শে অনেক দেশ ও নগর, শিল্পকলার মূল্যবান সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। চিঙ্গিজের জগৎজোড়া রাজ্যে সকলেই যে-যার নিজের ধর্ম পালন করতে পারত। ধর্মের জন্য কেউ লাঞ্ছনা পীড়ণ ভোগ করত না।

ইউয়ান বংশ ও কুবলাই খাঁ (১২৮০-১৩৬৮খ্রীঃ): চিঙ্গিজ খাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পরিধি আরও বেড়ে যায়। তাঁর বংশধর কুবলাই খাঁ প্রথমে চীনের শাসন কর্তা, পরে চীনের সম্রাট হন। তিনিই **ইউয়ান বংশের** প্রতিষ্ঠাতা এবং ইতিহাসে '**গ্রেট খান**' নামে বিখ্যাত। তাঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী বোগদাদ জয়। মোঙ্গলরা ইসলাম বিদ্বেষী ছিল। তাই কুবলাই খাঁর রাজত্বকালে এক সেনাপতি **হলাগু** বোগদাদ আক্রমণ করেন এবং অনেক লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা করে শহর অধিকার করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বোগদাদের সেচ-প্রণালীর যাবতীয় ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন। মনে রাখতে হবে যে এই সেচ-প্রণালী অতি প্রাচীন কাল থেকে সমগ্র মেসোপটেমিয়াকে শস্য-শ্যামল ও জনাকীর্ণ করে রেখেছিল। এই ঘটনার পর বোগদাদে আব্বাসীয় খলিফারা নিস্তেজ হয়ে পড়েন। কুবলাই খাঁ তাঁর রাজধানী পিকিং-এ বদল করেন। এইখানে বসে তিনি পৃথিবীর নানাদেশের রাজদূত ও পর্যটকদের অভ্যর্থনা করতেন। মোট কথা, পৃথিবীর কোন সম্রাটই বোধহয় কুবলাই

খাঁর মত এত বড় রাজ্য শাসনের অধিকার লাভ করেন নি। মোঙ্গলরা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি রাজ্য গড়ে তোলে। এদেরই বংশধর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। চিঙ্গিজের মৃত্যুর দেড়শো বছর পরে তৈমুর নামে আর একজন মোঙ্গল অধিপতি
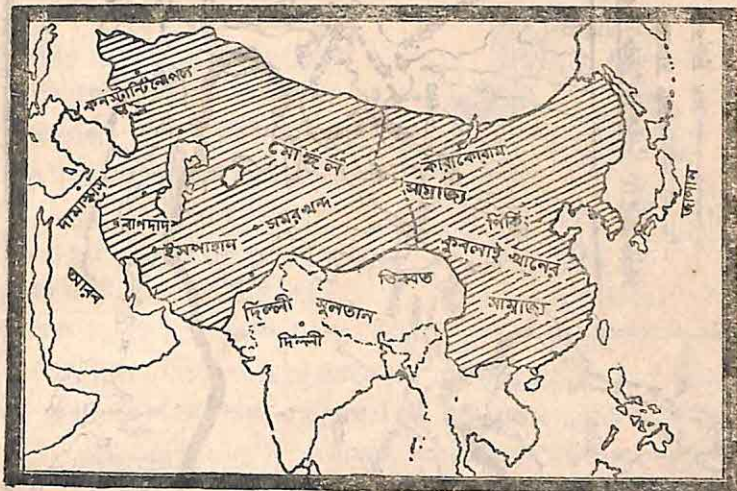
সমরকন্দের সিংহাসনে বসেন। তিনি এক নিষ্ঠুর হানাদার বলে ইতিহাসে খ্যাত। তুর্কীর সুলতানকে তিনি খাঁচায় পুরেছিলেন। তৈমুর ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটদের পূর্ব-পুরুষ, মায়ের দিক দিয়ে চিঙ্গিজ খাঁর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল। তিনি মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বহু চেষ্টা করেন। সমগ্র এসিয়া মহাদেশের এক বিস্তৃত অংশ তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নেয়।

ইতিহাসে যত বড় সাম্রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে আয়তনে সব চেয়ে বিশাল ছিল মোঙ্গল সাম্রাজ্য। মোঙ্গলরা ক্রমশঃ জাতীয় স্বভাব ছেড়ে চীনের সভ্য রীতি গ্রহণ করে। কুবলাই খাঁ সেই হিসাবে চীনের সম্রাট। এই সময়ে সাম্রাজ্যের কতক অংশে তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ছিল। তাঁর রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হত। অনেক পাদরী পণ্ডিত ব্যবসাদার ও শিল্পী য়ুরোপ আরব পারস্য বাইজনটাইন সাম্রাজ্য থেকে প্রায়ই এই সভায় আসতেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের যাতায়াতের ফলে জ্ঞান-বিস্তারের পথ খুলে গিয়েছিল।

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ভিতরকার অবস্থা আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে ইটালির পর্যটক মার্কো পোলোর মনোজ্ঞ বিবরণ থেকে আমরা কুবলাই খাঁ ও চীন দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছি। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কো পোলোর পিতা ও পিতৃব্য সর্বপ্রথম কুবলাই খাঁর রাজ্যে উপস্থিত হন। তাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন। দ্বিতীয়বার ভ্রমণের সময় তাঁরা স্থলপথে পুত্র মার্কো পোলোকে নিয়ে পিকিং যাত্রা করেন। (মানচিত্র

দেখ) মার্কো পোলো চীন দেশে দীর্ঘ ষোল বছর বাস করেছিলেন। অবশেষে তিনি হ্যাংচাউ শহরের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। তারপর বিদেশে আর তাঁর ভাল
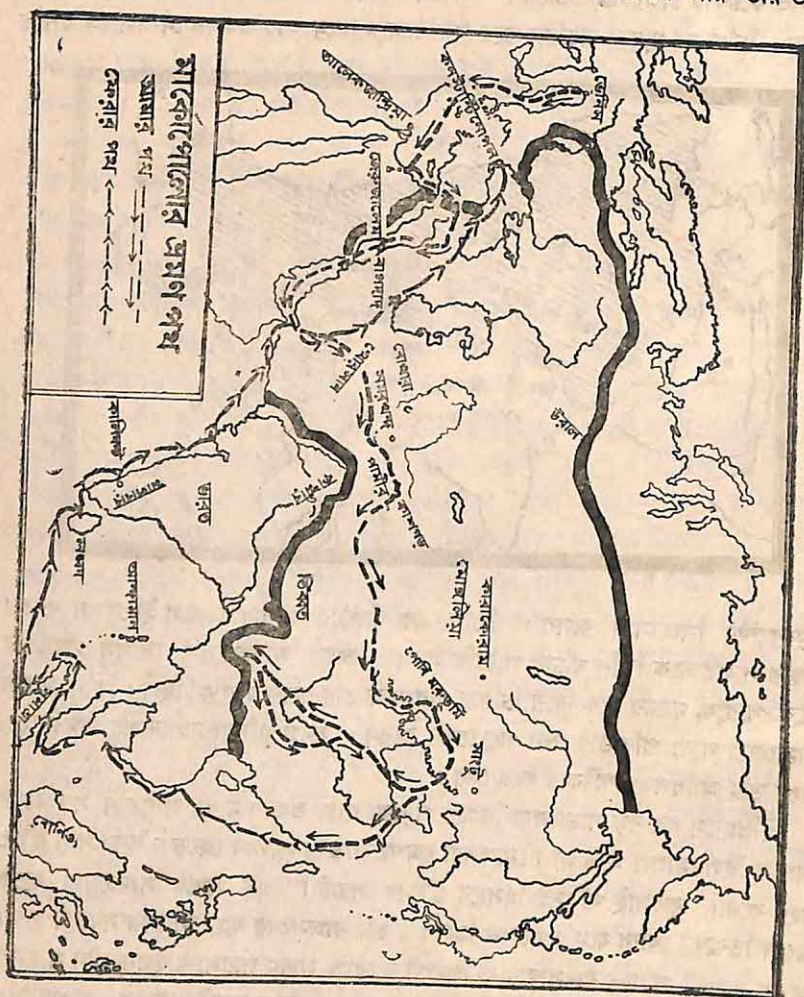
লাগল না। জলপথে চীন সুমাত্রা ও ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে দু বছর পর মার্কো পোলো পারস্যে আসেন, তারপর ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল দেশের পোশাক পরে নিজ মাতৃভূমি ভিনিসে ফিরে আসেন।

তিনি পিকিং-এ কুবলাই খাঁর রাজসভার ও চীন দেশের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কুবলাই খাঁ শিক্ষিত উদার ছিলেন। সকল ধর্মের প্রচারকই তাঁর কাছে আসতেন তিনি কাউকে ফেরাতেন না। সম্রাট মজা করে বলতেন, সকলের মিলিত

প্রার্থনায় স্বর্গে তাঁর আসন পাকা হবে। চীন ছিল বিশাল সমৃদ্ধশালী দেশ। সেখানে অসংখ্য দ্রাক্ষাক্ষেত, সুন্দর পান্থশালা, মনোরম উদ্যান, শস্যপূর্ণ মাঠ ও বৌদ্ধ চৈত্য মার্কো পোলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কো পোলো বলেন, রাজ-প্রাসাদের নাম ছিল **খানবালিক**। তার প্রাচীর ৫০ ফুট উঁচু ও ২০ ফুট চওড়া। ঘরের দেয়ালগুলি অতি সুন্দর চিত্রিত। সম্রাটের চার স্ত্রী. বড় রানীর নাম ছিল **জমুই খাতুন**। প্রাসাদের বাগানে অনেক পশুপক্ষী ঘুরত, চিতাবাঘও ছিল। প্রাসাদে উৎসব লেগে থাকত। রাজধানী ছাড়া হ্যাংচাউ শহর তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। এই দেশ তাঁর

কুবলাই খাঁ

ভিনিসের মতই সুদৃশ্য শহর। অগভীর খাল ও সমুদ্রের খাঁড়ি দেখলে তাঁর ভিনিসের কথা মনে পড়ত। এই শহরের বাঁধানো রাস্তাঘাট, অনেক দোকানপাট, উঁচু উঁচু পুল, সাধারণ স্নানাগার, সোনা, পশম ও মালের গুদাম, আর বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী দেখে মার্কো পোলো আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি জাপানের সোনা ও ব্রহ্মদেশের বিরাট সৈন্যদল ও হস্তিবাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতেও এসেছিলেন। সেখানে তাম্রপর্ণী নদীর উপর **পাণ্ড্যরাজ্যের কয়াল** শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রকাণ্ড বন্দর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। দক্ষিণ ভারতের এক বড় রানীর কথা উল্লেখ করেছেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি নাকি অনেক যোগী ঋষি সচক্ষে দেখেছিলেন। মার্কো পোলোই সর্বপ্রথম 'ক্যাথে' বা চীন দেশের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার খবর শুনিয়ে য়ুরোপকে চমৎকৃত করেন এবং প্রাচ্য জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। তাঁর বিচিত্র ভ্রমণ কথা যে আবিষ্কারক কলম্বাসকে উৎসাহ জোগায়, সে কথা সত্য।

মার্কো পোলো

মার্কো পোলো আশ্চর্যভাবে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। ভিনিসের সঙ্গে জেনোয়ার যুদ্ধকালে মার্কো পোলো শত্রুহস্তে বন্দী হন। বন্দীশালায় সময় কাটাবার জন্য তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী মুখে মুখে বলে যান আর একজন তা লিখে নেয়। এই ভ্রমণ কাহিনী প্রথম কেউ বিশ্বাস করত না। পরে প্রমাণ হয় যে এর মধ্যে অনেক সত্য আছে।

মধ্য যুগে জাপান ঃ বর্তমান কালে জাপান একটি উন্নত আধুনিক সভ্য দেশ। এ দেশের মধ্য যুগের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে তার সমাজ ও অর্থব্যবস্থা সামন্ত যুগে অন্যান্য দেশের মতই ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে জাপানের দ্রুত শিল্পায়ন সুরু হয় এবং আধুনিক চেহারা পরিস্ফুট হয়।

মানচিত্র দেখলে বোঝা যায় জাপানের ভূগোলই তার ইতিহাস গড়েছে। হনশু কিউশু শিকোকু আর হোক্কাইডু এই চারটি বড় দ্বীপ আর উত্তর এসিয়ায় সাইবেরিয়া ও কোরিয়ার উপকূল ধরে অনেক ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ—এই নিয়ে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর আর পশ্চিমে জাপান সমুদ্রের উপর জাপানের অবস্থান। দ্বীপময় জাপান ইংলণ্ডের মতো মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে নিজ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পেরেছিল। তবে গোড়ার দিকে শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প ও ধর্মচর্চায় জাপান যে চীনের কাছে অনেক ঋণী সে কথা আগে বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে রোমান সভ্যতার উপর গ্রীক সভ্যতায় যেমন প্রভাব, জাপানের উপর চীনের প্রভাব অনেকটা সেই রকম। এখন মধ্য যুগে জাপান-রাষ্ট্রের গঠন, সে দেশের রাজনৈতিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থার কথা বলি।

সমাজ ও রাষ্ট্র ঃ জাপানের সমাজ এ যুগে কয়েকটি 'ক্ল্যান' বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এরা অভিজাত পরিবার-দল। এদের নিয়েই জাপানের সামন্ত সমাজ, সেখানে ঐ পরিবার-গোষ্ঠীরা ছিল সর্বেসর্বা। এখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে একটি রাজ্যের পত্তন হয়, তার রাজধানীর নাম **নারা**। প্রায় একশো বছর পরে নতুন রাজধানী স্থাপিত হল কিয়োতো শহরে। কিয়োতো শব্দটির মানে রাজধানী। জাপান সম্রাটরা হাজার বছরের উপর এখানে বসে রাজত্ব করতেন। প্রায় তিন শো বছর ধরে রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এক বড় অভিজাত পরিবারের হাতে। কিন্তু দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে দুই শক্তিশালী গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ বাধলে যে পক্ষ জয়ী হয়, তারাই দেশ শাসন করতে থাকে। এই সময় থেকে জাপানের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা হল, একে বলা হয় '**শোগানেট**' বা শোগুন শাসনতন্ত্র। 'শোগুন' অর্থাৎ সেনাপতি এখন থেকে হলেন জাপানের প্রধান সেনানায়ক এবং দেশের প্রকৃত শাসক।

মিকাডো ঃঃ শোগুন শাসনতন্ত্র ঃ দেশের সমস্ত শাসন কর্তৃত্ব চলে এল শোগুনদের হাতে। 'মিকাডো' বা সম্রাট দেবতার সামিল হয়ে থাকলেন সিংহাসনে। এখানে বলে রাখি, জাপানের আদি অধিবাসী ছিল 'আইনুজাতি'। আইনুদের বিশ্বাস যে প্রাণিজগতের সর্বত্র দেবতাদের অস্তিত্ব আছে। মোটামুটিভাবে, প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা নিয়ে যে ধর্মমত তার নাম '**শিণ্টো**' ধর্ম। শিণ্টো কথাটির অর্থ 'দেবতাদের পথ'। জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থাকলেও শিণ্টো ধর্মমতের অস্তিত্ব এখনও আছে। যাই হোক, যিনি প্রথম মিকাডো, তিনি দেবতাদের সন্তান, ঈশ্বর-প্রেরিত জাপানের অধীশ্বর। সেই বিশ্বাস অনুসারে সম্রাটের সর্বময় প্রভুত্ব, তাঁর মর্যাদা ও অধিকার, দেবতার সামিল তাঁর ব্যক্তিত্ব 'মিকাডো' পদটিকে জাতীয় ঐতিহ্য-গৌরবে মণ্ডিত করে

রেখেছে সেই মধ্য যুগ থেকে। আজ পর্যন্ত দেবত্বের তিনটি প্রতীক চিহ্ন, রত্নমালা তরবারি ও দর্পণ, মিকাডোর অধিকারে রয়েছে।

শোগুনের পদ ছিল বংশানুক্রমিক। কাজেই উত্তরাধিকার সূত্রে শোগুন শাসনতন্ত্র জাপানের রাজনীতিতে স্থায়ীভাবে কায়েম হয়েছিল ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু রাষ্ট্রের নেতা হিসাবে শোগুন যতই শক্তিশালী হোক, মিকাডোর দৈব পদ ও সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারত না। তাঁর সম্বন্ধে কোন রকম উল্লেখ আলোচনা ছিল অবৈধ। তবে মিকাডোর নাম নিয়ে তাঁকে আড়ালে রেখে শোগুনরা অনেক কাল ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। যেমন নেপালে কিছুকাল আগে পর্যন্ত রানা-গোষ্ঠীর হাতে দেশশাসনের সমস্ত অধিকার ছিল। রাজার কোনও ক্ষমতাই ছিল না। এখন অবশ্য রাজাই আসল শাসক। জাপানের এই রকম রাজনীতির সঙ্গে তার সমাজ-ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এখন মধ্য যুগে জাপানী সমাজের, বিশেষ করে ভূমি-ব্যবস্থা ও শ্রেণী বিভাগের কথা বলছি। তাহলে বুঝতে পারবে যে জাপানেও অনেকটা একই ধরনের সামন্তসমাজ ও সামন্ত-প্রথা চলছিল। মিকাডো যখন নামে মাত্র রাষ্ট্রের প্রধান, জনসাধারণ আর শাসন কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কিয়োতো নগরে নিভৃত জীবন যাপন করতেন, তখন 'ফিউডাল ওভারলর্ড'রা (শক্তিশালী ও অর্থশালী সামন্তবর্গ) রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত।

সমাজে শ্রেণীবিভাগ ঃ এই সব বড় বড় সামন্তদের অধীনে বহু সংখ্যক সশস্ত্র যোদ্ধা (সামুরাই) ছিল, মধ্য যুগে য়ুরোপে সামন্তরা যেমন নিজস্ব সৈন্যদল পোষণ করত। সামন্তশ্রেণী কয়েকটি দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। শাসন ক্ষমতা দখল করার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকত। সতেরো শতক থেকে টকুগাওয়া গোষ্ঠী শোগুন পদ একচেটিয়া অধিকার করেছিল। এখন, মধ্য যুগে জাপানের সমাজ যে সব 'ক্লাস' বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান পেত সামুরাই যোদ্ধাদল। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ত অলস বিলাসী 'ডেমিওস' দল এবং রাজকর্মচারীর দল। এরা নানা প্রকার বিশেষ অধিকার ও সুযোগ ভোগ করত। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে সৈন্যদল পড়লেও, সাধারণ সৈনিকদের সে রকম অধিকার ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল কৃষকদল যারা নিষ্ঠুর শোষণ এবং খাজনা ও করের চাপে উৎপীড়ন সহ্য করত। তৃতীয় শ্রেণী হল কারিগর ও শিল্পীদের নিয়ে এবং চতুর্থ শ্রেণী হল বণিক ব্যবসায়ী-দল। এরা বাহ্যতঃ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু কার্যতঃ সমাজে বণিকদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে শ্রম-শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। আর চাষী-মজুর গোষ্ঠীকে বাহ্যতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হলেও আসলে তারা রিক্ত বিত্ত অসহায় সব চেয়ে নীচু শ্রেণীর মানুষ। এদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা য়ুরোপীয় সামন্ত সমাজে সেই 'সার্ফ' বা ভূ-দাস শ্রেণীর থেকে তফাৎ ছিল না।

সামন্ত প্রথায় ভূমি ব্যবস্থা ঃ গোড়ার যুগে জাপানে অনেক তালুক ছিল যেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেখানে জমি চাষ করত ভূমিদাসেরা, জমির মালিকরা

সরকারকে খাজনাপত্র দিত না। রাষ্ট্রেরও অনেক খাস জমি ছিল, কিন্তু খাজনার ভার এত বেশী ছিল যে চাষীরা পালিয়ে যেত। সরকার তখন অগত্যা ঐ সব জমি বিলি করে দিতেন যোদ্ধা-সম্প্রদায় 'সামুরাই'দের কাছে, যেমন পশ্চিম য়ুরোপে রাজারা 'নাইট'দের মধ্যে জমি বিতরণ করতেন। এই ভাবে জাপানের সমাজে বড় জমিদারশ্রেণীর উদয় হল। আবার পশ্চিম য়ুরোপে মধ্য যুগে যেমন বড় মঠগুলির বিস্তর বিষয় আশয় ছিল, জাপানেও তেমনি বৌদ্ধ মঠগুলি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। সে সব জমিতে চাষীরা মেহনত করত। কিন্তু জমির মালিক যেই হোক, কৃষকদের অবস্থা সর্বত্র একই রকম দুর্বহ ছিল। স্বাধীন কৃষকরা বেশীর ভাগ ভূমিদাসে পরিণত হত, কেননা খাজনা মেটাবার সামর্থ্য তাদের থাকত না। চাষ করে যে ফসল তারা ভাগে পেত তার তিন ভাগের দু'ভাগ দিতে হত কর হিসাবে। অবশিষ্ট কিছুই থাকত না বলে ক্রমে তারা জমিতেই লগ্নী হয়ে রইল, জমি ছেড়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। এখানেও সেই য়ুরোপের 'সার্ফ'দের মতই দুর্দশা। আর একটি ক্ষেত্রেও মিল দেখা যায়—সেটি হল শ্রমশিল্প। কারু শিল্পের প্রসারের ফলে জাপানে ক্রমশঃ নগর গড়ে ওঠে এবং মধ্য যুগের শেষ দিকে তাদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। ক্রমে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সরাসরি রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হয়, কারণ বিদেশীদের সংস্রব থেকে দূরত্ব রেখে চলাই ছিল জাপানের নীতি।

সাহিত্য ধর্ম ও শিল্প ঃ এসিয়া মহাদেশে কোরিয়া জাপানের নিকটতম প্রতিবেশী। তাই কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানের সঙ্গে চীনের শিক্ষা-সংস্কৃতি ধর্মমত শিলপকলার অনেক বৈশিষ্ট্য জাপানের সভ্যতায় মিশে আছে। সেগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তা বলছি। প্রথমতঃ চীনের সঙ্গে জাপান খুব প্রাচীন কাল থেকে নিকট সম্পর্ক বজায় রেখেছিল বলে চীনা লিপি থেকে জাপানী লিপির জন্ম। জাপানের ভাষা আলাদা কিন্তু দুই লিপিই সাংকেতিক। হরফগুলি কোন ভাব বা বস্তু নির্দেশ করে, শব্দের উচ্চারণ-ধ্বনি বহন করে না। দ্বিতীয়তঃ জাপানের সাহিত্যে চীনের প্রভাব সুস্পষ্ট। জাপান থেকে শিক্ষার্থীরা চীনা দর্শন ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পড়তে যেত। তার ফলে জাপানে চীনা কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের সমাদর বাড়ে। মধ্য যুগে যখন জাপানে নিজস্ব কাব্য ও কথা-সাহিত্যের চর্চা সুরু হয় নিজেদের ভাষায়, তখন বড় ঘরের কোনো কোনো মহিলা কবিতা উপন্যাস লিখে নাম করেন।

এই প্রসঙ্গে 'হাইকু' নামে এক ধরনের কবিতার কথা বলতে হয়, কারণ সাহিত্য জগতে তিন লাইনের এত সংক্ষিপ্ত কবিতা আর কোথাও নেই। ৬+৫+৬, মাত্র সতেরোটি অক্ষর নিয়ে এই ছোট্ট আকারের কবিতা জাপানের এক বিশিষ্ট দান। আঁট-সাঁট গড়ন, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে একটি ভাবচিত্র রচনাই এ কবিতার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই বিখ্যাত হাইকু কবিতার দুটি নমুনা দিয়েছেন ঃ

পুরানো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎ কাল।

মধ্য যুগে জাপানে 'কাবুকি' নামে এক ধরনের রঙ্গমঞ্চের প্রচলন হয়। তার প্রভাব বর্তমান কালে অনেক দেশের অভিনয়-মঞ্চে লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতায়

জাপানী চিত্র শিল্পের নমুনা—মেঘে ভাসমান বোধিসত্ত্ব

ও থিয়েটারে নতুন ধরনের পরীক্ষা ছাড়া, মধ্য যুগে স্থাপত্য চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও নৃত্য—এই চারটি শিল্পচর্চায় জাপান মধ্য যুগে নিজস্ব রীতির প্রবর্তন করে যে রকম নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপানে চায়ের চর্চা এসেছিল চীন থেকে তাং যুগে। সেই থেকে চা-পান, চা-পরিবেশন, চা-ঘরের ব্যবস্থা এই সব নিয়ে জাপানে রীতিমত সামাজিক প্রথা গড়ে উঠেছিল। আধুনিক জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি এই সব শিল্প-উপাদান দিয়েই মধ্যযুগে তৈরী হয়েছিল। আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার, সেটি 'ইকেবানা' বা পুষ্পসজ্জার কৌশল। মধ্য যুগে জাপানে ফুল সাজানোর এই বিশিষ্ট রীতির উদ্ভব। আধুনিক কালে বহু দেশে 'ইকেবানা'র চর্চা হয়। এত সুন্দর ও সূক্ষ্ম কৌশলে ফুলগুলি নানা ভঙ্গীতে সাজানো হয় যে একে একটি আর্ট

গান্ধার
মিরান
তিব্বত
টুং-হুয়াং
য়ানকিং
মাই-চী-সান
চেংটু
নানকীং
চীন
কোরিয়া
সোখুরাম
জাপান
নারা
সারনাথ
অজন্তা
অমরাবতী
ব্রহ্মদেশ
থাইল্যাণ্ড
কম্বোডিয়া
বৌদ্ধধর্মের প্রসার
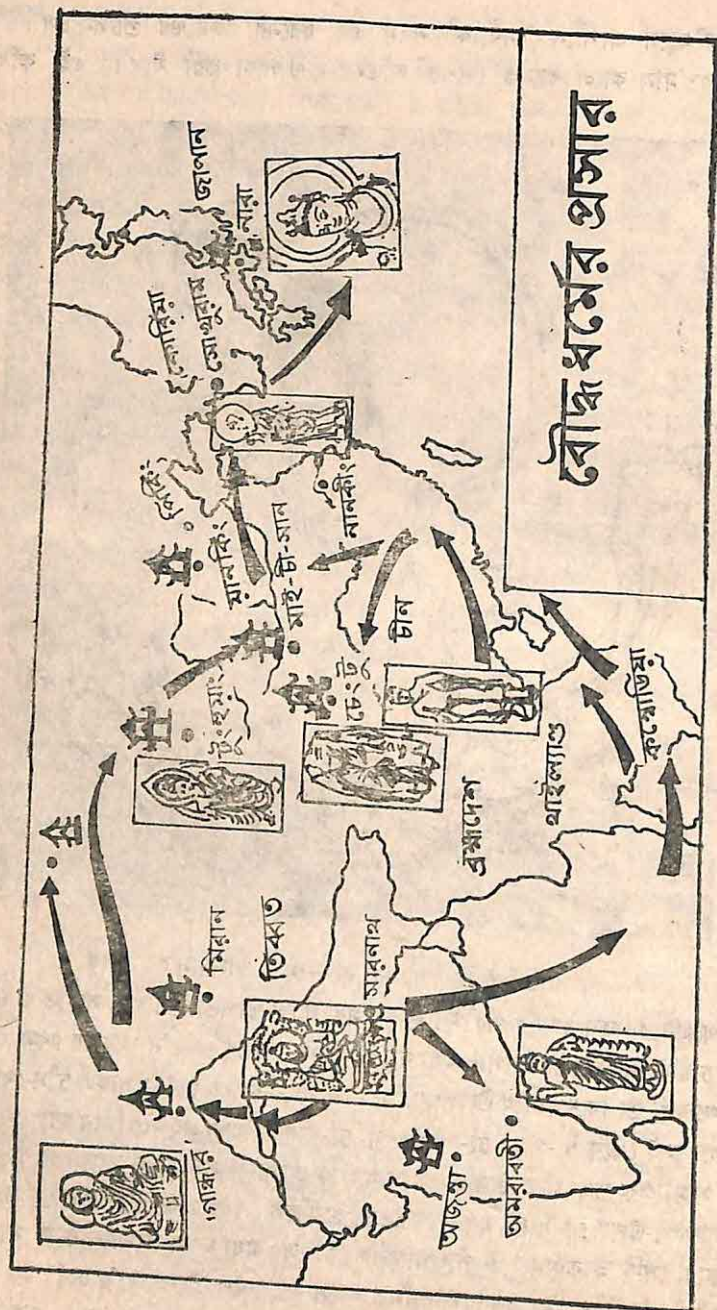
বলা চলে, যা জাপানের নিজস্ব দান। এই সূত্রে, মধ্য যুগে জাপানে একটি বিশেষ প্রথা বা প্রতিষ্ঠানের কথা বলি। তার নাম 'বুশিডো' অনেকটা য়ুরোপের 'শিভ্যলরি'র মতো। 'নাইট'দের মতই একটি বীর-সম্প্রদায়, যার লক্ষ্য—আদর্শ বীরত্ব, আর্তজনের রক্ষা, বিপদে সাহায্য দান এবং নিজের গোষ্ঠী ও তার উপর সম্রাটের জন্য প্রাণ উৎসর্গ দান।

আগেই বলেছি মধ্য যুগে জাপানে শিন্টো আর বৌদ্ধ, দুই ধর্মমত প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রাধান্য, তবে 'শিন্টো' মত বিলুপ্ত হয় নি। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক থেকে চীন-কোরিয়ার পথে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও প্রসার হতে থাকে। কালক্রমে জাপানে মধ্য যুগে কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'জেন' বৌদ্ধ ধর্মই প্রধান হয়ে ওঠে। 'জেন' কথাটি ভারতীয় 'ধ্যান' শব্দ থেকে এসেছে। 'জেন' সম্প্রদায় বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা ও আচার-নিষ্ঠা পালনের চেয়ে গভীর ধ্যানের উপরই জোর দিতেন বেশি। যাই হোক, জাপানে বৌদ্ধধর্ম যে তার শিল্পকলাকে খুব প্রভাবিত করেছে, তা সত্য। স্থাপত্য-কর্মে অর্থাৎ মঠ মন্দির প্যাগোডা নির্মাণে চীনা ডিজাইন ও পরিকল্পনা যেমন ধরা যায়, তেমনি ভাস্কর্য-শিল্পে অর্থাৎ মূর্তিগঠনে বৌদ্ধধর্মের ছাপ সুস্পষ্ট। নারায় বুদ্ধমন্দিরে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে তৈরী) এক বিশাল হল-ঘর ছিল যেটি প্রায় ৩০০ ফুট লম্বা, ১৮ ফুট চওড়া এবং ১৬২ ফুট উঁচু। মন্দিরের মধ্যে প্রায় ৯৭ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জে তৈরী বিরাট বুদ্ধমূর্তি।

মধ্য যুগে জাপানের রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার বর্ণনা এবং তারই সঙ্গে ধর্ম সাহিত্য ও শিল্পচর্চার পরিচয় দেওয়া হল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাপান মধ্য যুগে যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সব তাতেই পরিচ্ছন্ন মার্জিত সৌন্দর্যরুচির প্রমাণ দিয়েছে। আর সমাজব্যবস্থায় সামন্ত প্রথা ও শ্রেণীবিন্যাস যেমন পশ্চিম য়ুরোপে দেখা যায়, মধ্য যুগে জাপানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। চীন-জাপান প্রসঙ্গে শিল্পকলার নমুনার যে সব ছবি এবং বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধমূর্তি প্রসারের যে মানচিত্র দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই দুটি দেশের মধ্য যুগে সভ্যতার ধারণা করা সহজ হবে।

অনুশীলনী

॥ মধ্য যুগে চীন ॥

১। 'মৌ' প্রথা কি ?

২। তাং বংশের গৌরব সৃষ্টি করেন কে ? তাঁর সময় উত্তর ভারতে কে রাজত্ব করতেন ?

৩। তাং সাম্রাজ্যের আয়তন কিরূপ ছিল ?

৪। চীন দেশে ছবি আঁকা ও হাতের লেখা কি ধরনের ?
৫। তাং যুগে শিক্ষার্থীরা কোথা থেকে আসত, কোন কোন বিষয়ে পাঠ নিত ?
৬। তাং যুগের এক বড় কবি ও বড় দার্শনিকের নাম বল।
৭। চীনে কৃষি-ঋণ ও আয়কর প্রথা কে প্রবর্তন করেন ?
৮। সভ্যতায় চীনের কয়েকটি বড় দান উল্লেখ কর।
৯। চিঙ্গিজ খাঁ ইতিহাসে কি হিসাবে পরিচিত ? তিনি কি একেবারে বর্বর প্রকৃতির লোক ছিলেন ?
১০। তৈমুর লঙ কে ?
১১। 'গ্রেট সিল্ক রুট' মানে কি ? কোনখান দিয়ে গেছে ?
১২। কুবলাই খাঁ জাতিতে কি ? তাঁর বংশের নাম কি ? কোথায় তাঁর রাজধানী ছিল ? কুবলাই খাঁর রাজপ্রাসাদের নাম কি ?
১৩। মার্কো পোলো কোন দেশের লোক, কোন শহরের অধিবাসী ছিলেন ?
১৪। পিকিং ছাড়া চীনের আর একটি বড় শহরের নাম বল।
১৫। মার্কো পোলো কোন পথে দেশে ফেরেন ? দক্ষিণ ভারতে কোন রাজ্য ও কোন শহরের তিনি নাম করেছেন ?
১৬। য়ুরোপে চীন কি নামে পরিচিত ছিল ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। তাং রাজত্বের খ্যাতির কারণগুলি বল।
২। তাং যুগে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা বর্ণনা কর।
৩। সুং আমলের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? তাঁর কোন শাসন-সংস্কারগুলি উল্লেখযোগ্য ?
৪। সুং আমলে বিজ্ঞান চর্চার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।
৫। মোঙ্গলরা কোথায় বাস করত ? মোঙ্গলরা কি ভাবে জীবন যাপন করত ?
৬। কুবলাই খাঁর সময়ে চীনের সমৃদ্ধি অল্প কথায় বর্ণনা কর। কোথা থেকে তা জানা যায় ?

॥ মধ্য যুগে জাপান ॥

১। জাপানের ভূগোল কি ভাবে তার ইতিহাস গড়েছে ?
২। জাপানে বিচ্ছিন্নতার কারণ কি ?
৩। 'শোগুন' শাসনতন্ত্র বলতে কি বোঝায় ? কোন সময়ে এটির প্রবর্তন হয় ?
৪। 'মিকাডো' কাকে বলা হয় ? তাঁর কি কি প্রতীক চিহ্ন ছিল ?
৫। 'সামুরাই' কারা ? সমাজে তাদের কি স্থান ছিল।

৬। মধ্য যুগে জাপানী সমাজে কয়টি শ্রেণী ছিল ?
৭। দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী সম্বন্ধে কি জেনেছ ?
৮। মধ্য যুগে জাপানে কিভাবে ও কাদের মধ্যে জমি বিতরণ করা হত ?
৯। ভূমি-ব্যবস্থায় কৃষকদের কি অবস্থা হয়েছিল ?
১০। মধ্য যুগে জাপানে কি কি ধর্মমতের পরিচয় পেয়েছে ? এর মধ্যে কোনটি প্রধান ছিল ?
১১। জাপানী লিপির উৎপত্তি কোথা থেকে ? তার বৈশিষ্ট্য কি ?
১২। মধ্য যুগে জাপানে কোন কোন শিল্পের চর্চা ও উন্নতি হয়েছিল ?

এগুলি কি ও কোথায়, কিসের জন্য বিখ্যাত ?

কিয়োতো, শোগান, শিন্টো, নারা, ডেমিওস, হাইকু, ইকেবানা, জেন, কাবুকি, বুশিডো।

একাদশ অধ্যায়

মধ্য যুগে ভারত (পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)

[এক] **হূন আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন :** রোমান ও গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রায় একই সময়ে হূনদের আক্রমণ ও তার পরিণতির কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এখানে, ভারতের ইতিহাসে তার ফল কি হয়েছিল, তা বলছি। ইরান কাবুল অঞ্চল দখল করে হূনরা ভারতে প্রবেশ করে এবং ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দলে দলে এসে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে হীনবল করে ফেলে। সম্রাট স্কন্দগুপ্তের আমলে দু'বার আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু হূনরা রাজ্য ধ্বংস করতে পারে নি। প্রথমবার স্কন্দগুপ্ত বীর বিক্রমে শত্রুদের পরাস্ত করেন। বারাণসীর পূর্ব দিকে ভিতারি শিলালিপিতে এই হূন বিতাড়নের কথা উল্লেখ করা আছে। পরে আর এক বিখ্যাত বীর মালবরাজ যশোবর্মদেব হূনদের বিধ্বস্ত করেছিলেন, কিন্তু হূনদের বার বার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

ফলাফল ও গুরুত্ব : হূনদের দলপতি তোরমান ও তাঁর ছেলে মিহিরকুল নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসাবে ইতিহাসে কুখ্যাত। পাঞ্জাব, মালব ও রাজস্থানের কিছু কিছু অংশ এদের দখলে চলে যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে উত্তর ভারতের কনৌজ, মালব, সৌরাষ্ট্র, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। ভারত-ইতিহাসে হূন আক্রমণের এটি প্রত্যক্ষ ফল। আর একটি পরোক্ষ ফল হয়েছিল, তা সামাজিক। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজপুতেরা শক-হূন প্রভৃতি বিদেশী জাতি থেকে উৎপন্ন। ভারতের উত্তরে ও পশ্চিমে এই সব আক্রমণকারী এসে বসবাস করেছিল। ক্রমশঃ তারা হিন্দু সমাজে প্রবেশ-অধিকার পেয়ে ভারতীয় হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে শক্তিমান গোষ্ঠীগুলি নিজেদের প্রাচীন সূর্য ও চন্দ্র বংশের হিন্দু সন্তান বলে পরিচয় দিতে থাকে। এদের অনেকেই সাহসী ও যুদ্ধনিপুণ ছিল। কালক্রমে এই উপজাতির দল শৌর্য্য-বীর্যের জন্য ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল শাখা ছিল গুর্জর। তারাই প্রতীহার বংশ প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য তারা গুর্জর প্রতীহার নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই বংশের অনেক বিখ্যাত রাজা মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে বিদেশীদের সঙ্গে মিশ্রণের বিপক্ষে হিন্দু সমাজে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা কিছু কঠোর হয়েছিল। রাষ্ট্র ও সমাজে যে পরিবর্তন দেখা দিল, তা থেকে ভারতের ইতিহাসে হূন আক্রমণের গুরুত্ব বিচার করা যায়।

হর্ষবর্ধনের আমল : (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হলে যে সব নতুন রাজবংশের উৎপত্তি হয়, তাদের মধ্যে একটি মৌখরি আর একটি পুষ্যভূতি। পুষ্যভূতিরা থানেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই থানেশ্বরের এক রাজা প্রভাকরবর্ধন হূনদের

তাড়িয়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী হন। তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশ' বছর পরে হর্ষবর্ধনের চেষ্টায় ও বিক্রমে উত্তর ভারতে আবার একটি বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত হয়। কনৌজ (কান্যকুব্জ) ছিল তারই রাজধানী। হর্ষের রাজত্বকালে এই প্রাচীন নগরীর সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি খুব বেড়ে যায়। হর্ষবর্ধনের মত গুণী জ্ঞানী ও প্রতাপশালী রাজার যোগ্য রাজধানী ছিল ঐ সুশোভিত কনৌজ নগরী। পরবর্তীকালে গুর্জর-প্রতীহার ও পাল সম্রাটদের আমলে কনৌজ আরও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হর্ষের রাজ্যলাভ ঃ থানেশ্বরের রাজ্য প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন, আর একটি মাত্র কন্যা, নাম রাজ্যশ্রী। এই কন্যার বিবাহ হয় মৌখরি বংশীয় রাজা গ্রহবর্মার সঙ্গে। থানেশ্বর রাজবংশের পরম শত্রু ছিলেন মালবের রাজা দেবগুপ্ত, আর দেবগুপ্তের বন্ধু ও সহায় হলেন বাংলার কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক যিনি বাংলার প্রথম স্বাধীন ও প্রতাপশালী রাজা। প্রভাকর-বর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হলেন। অল্পকাল পরে মালবরাজ দেবগুপ্তের হাতে ভগিনীপতি গ্রহবর্মার পরাজয় ও ও হত্যার সংবাদ পেয়ে তিনি শত্রুর হাতে বন্দিনী ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য ছুটলেন। মালবসৈন্য তাঁর কাছে হেরে গেল বটে, কিন্তু তিনি নিজে শশাঙ্কের কাছে পরাস্ত ও নিহত হলেন। রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে বনে চলে গেলেন।

হর্ষবর্ধন

এই ঘোর বিপদের সময় হর্ষকে রাজপদ নিতে হল। সিংহাসন পেয়ে শশাঙ্ককে দমন আর বোনকে উদ্ধার করাই তাঁর সঙ্কল্প হল। বিধবা রাজ্যশ্রী জীবনের সুখশান্তি হারিয়ে বনের মধ্যে আগুনে ঝাঁপ দেবার আয়োজন করছিলেন, হর্ষ তাঁকে খুঁজে পেয়ে সঙ্গে করে আনলেন। মৌখরি রাজ্যটি হর্ষ তখন আপনার অধিকারভুক্ত করে থানেশ্বর থেকে কান্যকুব্জে রাজধানী সরিয়ে আনেন। রাজা হয়ে তিনি 'শীলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।

সাম্রাজ্য ও শাসন ঃ তারপর হর্ষ গৌড়ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অনেকে শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী কঠোর প্রকৃতির লোক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা বোধহয় সত্য নয়। যুদ্ধে কার পরাজয় হল, তাও বলা কঠিন। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের জীবিতকালে হর্ষ তাঁকে হারাতে পারেন নি। যাই হোক, শশাঙ্ক ছাড়া অনেক রাজাই হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করেন, যেমন, মগধের গুপ্ত রাজারা ও শশাঙ্কর পরাক্রমে ভীত কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা। বিন্ধ্য ও নর্মদা অতিক্রম করে হর্ষ দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হলে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাস্ত হন। 'উত্তরাপথনাথ' হর্ষবর্ধনের এই পরাজয়ের কথা চালুক্যরাজের আইহোল 'প্রশস্তি'তে লেখা আছে, তবে কেউ কেউ একথা স্বীকার করেন না। পশ্চিম দিকে সৌরাষ্ট্রের বলভি
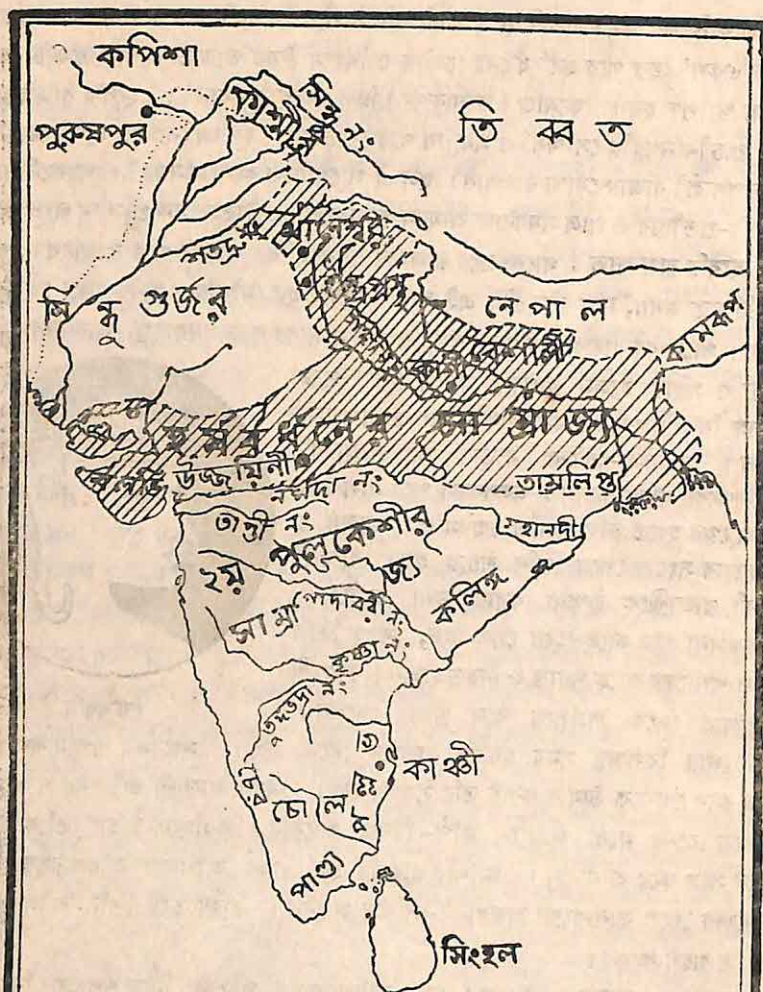
কপিশা
পুরুষপুর
কাশ্মীর
সিন্ধু নং
তিব্বত
শতদ্রু নং
সিন্ধু
গুর্জর
নেপাল
কামরূপ
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
উজ্জয়িনী
নর্মদা নং
তাম্রলিপ্ত
তাপ্তী নং
পুলকেশীর
মহানদী
২য়
সাম্রাজ্য
গোদাবরী নং
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা নং
তুঙ্গভদ্রা নং
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
সিংহল
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
আনুমানিক সীমান্ত
স্কেল মাইল
০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০

রাজা হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করেন আর পূর্বদিকে মগধ ও কঙ্গোদ রাজ্য তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। এই ভাবে হর্ষ উত্তর ভারতে আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন হল মোটামুটি উত্তরে হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত আর পূর্বে কামরূপ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন, হর্ষ মধ্য ভারতের একজন খুব বড় রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু সমস্ত উত্তর ভারতের সম্রাট তাঁকে ঠিক বলা যায় না। অনেক অংশ, যেমন সিন্ধু কাশ্মীর, তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনের এলাকায় আসেনি। যাই হোক, তখনকার উত্তর ভারতের সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্য সুশাসিত ছিল, এ কথা নিশ্চিত। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের শাসন-ব্যবস্থাই মোটামুটি এই সময়ে চলছিল, যদিও শান্তিরক্ষায় গুপ্ত যুগের তুলনায় এ যুগে কিছু অবনতি দেখা যায়। হর্ষবর্ধন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিজে পরিদর্শন করতেন এবং সর্বত্র শাসনের কাজ সম্বন্ধে সংবাদ নিতেন। জমির খাজনা ছিল শস্যের এক ষষ্ঠাংশ আর রাজপুতেরা বেতনের বদলে জমি ভোগ করতেন। কারাদণ্ড অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি ব্যবস্থা থেকে মনে হয়, শাস্তির আইন কঠোর ছিল।

হর্ষ নিজে সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন, হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। 'প্রিয়দর্শিকা', 'নাগানন্দ' ও 'রত্নাবলী', এই তিনটি সংস্কৃত নাটক তাঁরই রচনা বলা হয়। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃত আখ্যান 'কাদম্বরী'র লেখক ও কবি

হর্ষবর্ধনের হস্তাক্ষর

বানভট্ট ছিলেন হর্ষের সভাসদ। বাণভট্ট তাঁর পৃষ্ঠপোষক হর্ষবর্ধনের ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যে জীবন কথা লিখে গেছেন, তার নাম 'হর্ষচরিত'।

ধর্মসভা ও দানমেলা ঃ প্রথম জীবনে শৈব, পরে বৌদ্ধ মত গ্রহণ করে হর্ষ প্রায় পাঁচ বছর অন্তর এক একটি মেলার অনুষ্ঠান করতেন। প্রয়াগে এই রকম কয়েকটি মেলা হয়েছিল। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন কনৌজে উপস্থিত হন, তখন হর্ষ সেখানে এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেন। কুড়ি জন করদ রাজার সঙ্গে হর্ষ প্রতি-দিন একটি সোনার বুদ্ধমূর্তির মাথায় রাজছত্র ধরে শোভাযাত্রায় বেরুতেন পথে যেতে যেতে অনেক ধনরত্ন বিতরণ করতেন। এর পর হর্ষ প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড দানমেলার অনুষ্ঠান করতেন। তিনদিন ধরে খুব ধুমধাম চলত। প্রথম দিন হর্ষ বুদ্ধের পূজা করতেন, দ্বিতীয় দিনে সূর্যের, আর তৃতীয় দিনে শিবের অর্চনা করতেন। এই থেকে মনে হয়, হর্ষ বৌদ্ধ হয়েও হিন্দু দেবতার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রত্যেক দিন বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও দীনদরিদ্রদের প্রচুর অর্থদান করা হত। শেষ দিনে রাজভাণ্ডার উজাড় করে দানমেলা সাঙ্গ হত আর হর্ষ নিজের পোষাক

অলঙ্কার পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেন। তারপর তিনি ও ভগ্নী রাজ্যশ্রী ভিক্ষুর বেশ পরে ঘরে ফিরতেন।

হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে আমরা যে সব তথ্য জানতে পারি, তার কিছুটা 'হর্ষচরিত' আর বেশির ভাগ হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী থেকে। এ ছাড়া হর্ষের কয়েকটি তাম্রশাসন থেকে তাঁর শাসনব্যবস্থা ও সামন্ত রাজাদের কথাও কিছু কিছু জানা গেছে। তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। তিনি সুপণ্ডিত, দানশীল ও বৌদ্ধধর্মের শেষ পৃষ্ঠপোষক বলে ইতিহাসে খ্যাত। ৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিউয়েন সাঙ এর ভ্রমণ কথাঃ চীন পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিস্তৃত বিবরণী খুব সুখপাঠ্য। তেরোশ' বছরেরও আগে হর্ষবর্ধনের রাজত্বে তিনি ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। বুদ্ধদেবের পবিত্র জন্ম ও কর্মস্থল ভারত। এখানেই তাঁর সাধনা ও দেহত্যাগ, এখানেই তিনি তাঁর অমূল্য উপদেশ বিতরণ করেন যা সুদূর চীন থেকে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ-এর মত জ্ঞানবান তীর্থ পথিককে ভারত দর্শনে টেনে এনেছিল।

হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ কোন পথে কিভাবে ভারতে পেঁছিলেন সেটুকু গোড়ায় সংক্ষেপে বলে নিচ্ছি। চীন দেশের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখবেন, সেখানে বৌদ্ধধর্ম শিখবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি ঘর ছেড়ে বেরুলেন। সে সময়ে চীন থেকে বিদেশ যাত্রার নিয়ম ছিল না, তাই তাঁকে গোপনে দেশত্যাগ করতে হয়। পথে যেতে যেতে তিনি ভয়াবহ গোবি মরুভূমির মধ্যে এসে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কোনও দিকে পথের নিশানা নেই, তাই মানুষ ও পশুদের কঙ্কাল দেখে তিনি এগুতে লাগলেন। তৃষ্ণার জল না পেয়ে তাঁর অশেষ দুর্গতি হয়েছিল। অবশেষে বহু কষ্টের পর হিউয়েন সাঙ তিয়েন সান বা চীনা তুর্কিস্তান প্রদেশে প্রবেশ করলেন। সেখানকার রাজা বা খান তাঁকে খুব সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন। তিনি পণ্ডিত অতিথিকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং চালের তৈরি পিঠা, দুধের সর, মধু প্রভৃতি খাদ্য দিয়ে তাঁকে তৃপ্ত করলেন।

হিউয়েন সাঙ রাজাকে বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথাগুলি বুঝিয়ে দেন ও তাঁকে দীক্ষিত করেন। সেখান থেকে একটি দোভাষী নিয়ে তিনি তারপর সমরকন্দ পেঁছুলেন। এই শহর তখন মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানে সুন্দর তেজী ঘোড়া ও চমৎকার হাতের কাজের জিনিসপত্র বিক্রী হত। এই ভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি গান্ধার প্রদেশে হাজির হলেন। তারপর ভারতে এসে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতি

হিউয়েন সাঙ-এর
আগমন ও প্রত্যাবর্তন
আমুদরিয়া নদী
বোখারা
তাসখন্দ
সমরখন্দ
বল্হীক
বামিআন
কুন্দুজ
চিত্রল
কাপিশী
পুরুষপুর
গান্ধার
গজনী
হিন্দুকুশ পর্বত
সিন্ধুনদ
কাশ্মীর
কাশগড়
তারিম নদী
তকলা মাকান
মরুভূমি
খোটান
কারাশর
টুরফান
হামি
টুনহুয়াং
লিআংচাউ
লোইয়াং
হোয়াংহো
চাংআন (সিংআন)
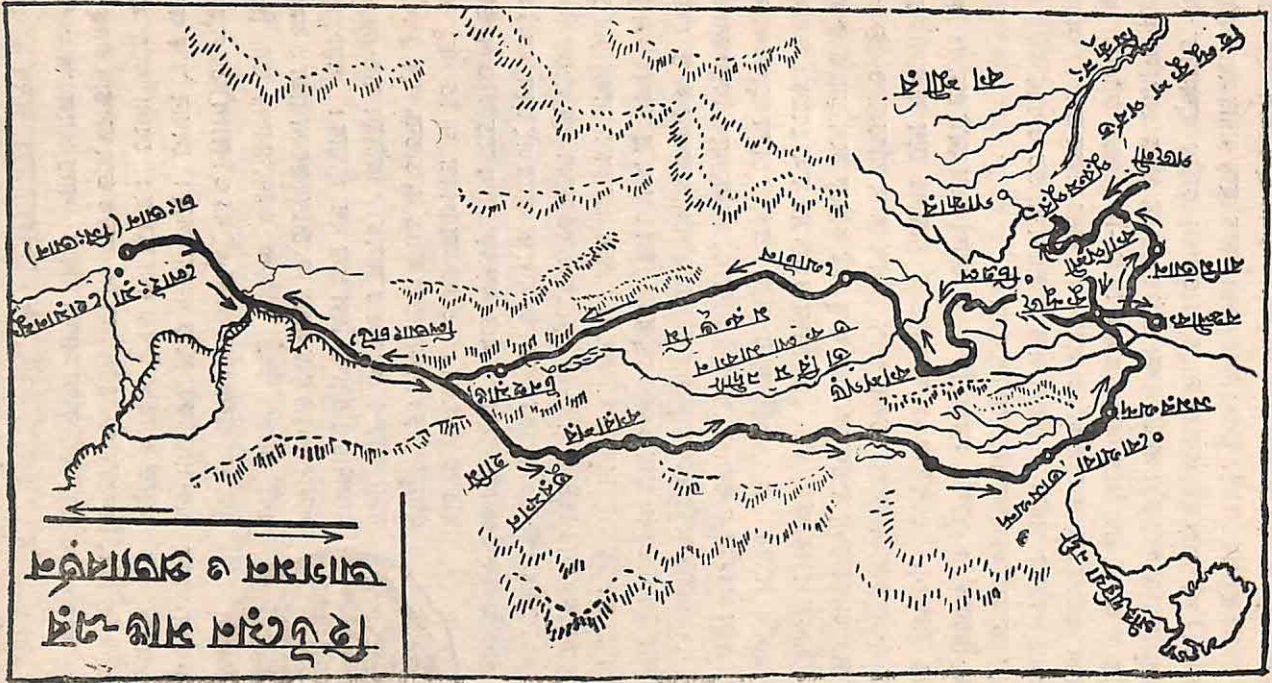
ও বন্ধুত্ব হল। হর্ষের রাজত্বে আট বছর কাটিয়ে তিনি সব সুদ্ধ ষোল বছর বিদেশ বাসের পর আবার স্থলপথ দিয়েই স্বদেশে ফিরে যান। ভারত ছেড়ে যাবার সময় হিউয়েন সাঙ অনেক দামী পুঁথিপত্র, ছবি এবং সোনা, রূপা ও চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যান। দেশে ফিরবার পরে চীন সম্রাট বিশেষ সমাদর জানিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। হিউয়েন সাঙ যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে যান, তার নাম **সি-ইউ-কি**। এই কাহিনী থেকে খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ধর্ম ও সমাজ এবং উত্তর দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি বিশেষ রাজ্যের পরিচয় পাই। হিউয়েন সাঙ ছিলেন সুপণ্ডিত ও ধার্মিক। তাই বৌদ্ধধর্ম ও আচারনীতির সম্বন্ধেই বেশি লিখেছেন।

ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা ঃ হর্ষের সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, বিদেশীদের কাছে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের দেশ বলে পরিচিত। শিক্ষিত সমাজে দেবভাষা সংস্কৃতের প্রচলন বেশি, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও এই ভাষা ব্যবহার করেন। ভারতে নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু কেউ কাউকে উৎপীড়ন করে না। 'মধ্যদেশের' লোকরা সুসভ্য ও মার্জিত, তারা শিক্ষা ও সংযমের মূল্য বোঝে। আগেকার মত বৌদ্ধ ধর্মের সুদিন নেই। পাটলিপুত্র শ্রাবস্তী প্রভৃতি বৌদ্ধ যুগের কয়েকটি বিখ্যাত নগর এখন জনহীন ও ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ। বিদেশীদের আক্রমণে, বিশৃঙ্খলা এবং অনাদরে এই সব জায়গা পূর্বগৌরব হারালেও তাদের জৌলুস একেবারে লুপ্ত হয়নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখনও প্রায় ৫,০০০ বৌদ্ধ মঠ ছিল। কাশ্মীর জলন্ধর কান্যকুব্জ বৈশালী বুদ্ধগয়া প্রভৃতি জায়গায় অনেক ভিক্ষু ও পণ্ডিত মঠে থেকে লেখাপড়ার চর্চা ও ধর্ম আলোচনা করতেন। হিউয়েন সাঙ-এর হিসাবে এঁদের সংখ্যা দুই লক্ষের উপর।

নালন্দা ঃঃ শিক্ষাব্যবস্থা ঃ বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নগরে এই রকম একটি মঠে তখন এক প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মঠে বড় বড় বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতরা ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁদের অধ্যাপনার খ্যাতি বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষালাভের জন্য চীন, তাতার, পূর্ব উপদ্বীপ, নানা দূরদেশ থেকে ছাত্র আসত। হিউয়েন সাঙ-এর সময় নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার খরচ লাগত না, দেশের ছয়জন রাজা ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তির উপর ছাত্রদের ভরণপোষণের ভার ছিল। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ থেকে এই মঠ ও বিদ্যাপীঠের পুরানো ঘর-বাড়ি কিছু খুঁড়ে পাওয়া গেছে। সেখান থেকে অনেক মূর্তি ও স্তূপ উদ্ধার করা হয়েছে। শোনা যায়, মঠটি আগে ছয়তলা বাড়ি ছিল, তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়িগুলি এখনও ভাল অবস্থায় আছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীলমোহর

নালন্দায় ছাত্রদের জীবন ছিল কঠিন সংযমে বাঁধা। শাস্ত্র আলোচনা, 'স্থবির' অধ্যাপকের প্রতি ভক্তি, ধর্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতাই ছিল মহা-বিদ্যালয়ের আদর্শ। মঠের ভিতরে অধ্যাপনা শোনবার জন্য লম্বা ঘর, পাঠাগারের জন্য আলাদা কক্ষ আর ছাত্র-

নিবাসের উপযোগী টানা দালান-ঘরের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। নালন্দায় পুঁথির সঙ্কলন ছিল বিরাট। সে যুগের পণ্ডিত অধ্যাপকের অনেক নামও পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল, স্থিরমতি ও গুণমতি চরিত্রে ও বিদ্যাবত্তায় সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। মঠের প্রধান আচার্য ছিলেন মহাজ্ঞানী **শীলভদ্র**। অনেকের মতে এই বিশ্ব-বিশ্রুত অধ্যাপক ছিলেন বঙ্গের বা পূর্ব ভারতের লোক। মহাবিদ্যালয়ে তর্ক, জিজ্ঞাসা ও পরস্পর আলোচনা করাই ছিল পাঠরীতি। ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি ছিল কঠিন শাস্ত্র। প্রথম পাঠের নাম 'সিদ্ধিবস্তু'। অক্ষর-পরিচয় ও সহজ ব্যাকরণ শেষ হলে সুরু হত গদ্য ও পদ্য রচনা। ভাষাজ্ঞানের ভিত্তি পাকা করে তবে 'বিদ্যা' অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হত। হিউয়েন সাঙ শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব),
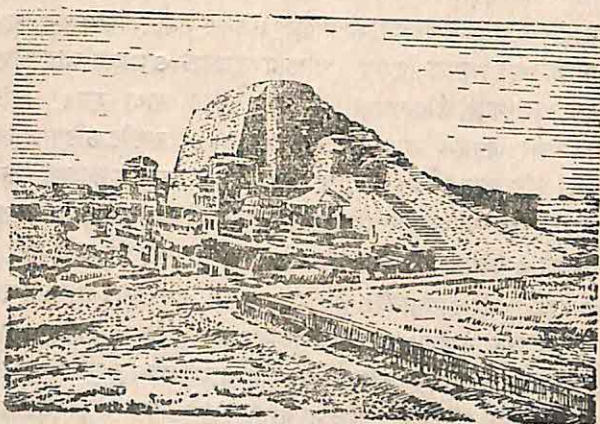
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসচিহ্ন

হেতুবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র), অধ্যাত্মবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও শিল্পস্থানবিদ্যা, এই পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায় নালন্দায় গভীর ও উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া ছিল খুব শক্ত ব্যাপার। সেখানে 'দ্বারপণ্ডিত' থাকতেন। শিক্ষার্থী এলে তাঁরা তাকে রীতিমত প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতেন। ঠিক মত জবাব দিতে পারলে তবেই সে ভর্তি হতে পারত।

দেশের অবস্থা ঃ হিউয়েন সাঙ দেশের ভিতরকার অবস্থার কথাও বলেছেন। তখনকার দিনে পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষির অবস্থা ভাল আর গ্রামগুলিতেও ঘন বসতি ছিল। তবে উত্তর ভারতে পথঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না, চোর-ডাকাতের বেশ উপদ্রব ছিল। গুপ্ত রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারতভ্রমণ করেন, কোথাও তাঁকে বিপদে পড়তে হয়নি। কিন্তু হিউয়েন সাঙ দু' দু' বার ডাকাতের

হাতে পড়েছিলেন। তবে হিউয়েন সাঙ এ কথা লিখেছেন যে, অপরাধীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সাধারণ লোক শান্তি প্রিয় এবং তাদের নীতিজ্ঞান আছে। একটু হঠকারী ও অস্থিরচিত্ত হলেও তাদের ধর্মভয় আছে, তারা প্রতারণা করে না এবং কথা দিয়ে কথা রাখে। তা ছাড়া, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভালভাবেই চলত। পশ্চিম ভারতে মালব গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে বিদেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। এ দিকে বাংলায় তখন তাম্রলিপ্ত একটি প্রধান বন্দর ছিল। সেখান থেকে চীন ও পূর্ব-সমুদ্রগামী জাহাজ ছাড়ত।

চালুক্য ও পল্লবরাজা ঃ হিউয়েন সাঙ ওড়িশা এবং দাক্ষিণাত্যেও গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাদামির চালুক্য এবং আরও দক্ষিণে পল্লব রাজাদের কীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা আগেই পড়েছ। এই সময়ে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে পুলকেশীর সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে গুজরাট ও মালব আর দক্ষিণে চোল পাণ্ড্য এবং পল্লভ রাজ্যগুলি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হিউয়েন সাঙ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে যখন এখানে আসেন, তখন দ্বিতীয় পুলকেশীর চরিত্র ও বিক্রম দেখে তিনি বলেছেন যে, তাঁর হৃদয় গভীর ও বুদ্ধি তীক্ষ্ন ছিল। চালুক্যরাজের সৈন্যসামন্তরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। হাতীর দলকে খেপিয়ে দিয়ে তুরী ভেরী বাজাতে বাজাতে তারা যুদ্ধে অগ্রসর হয়। হাতী ও সৈন্যবলের জন্য রাজা কোনও শত্রুকেই ভয় করে না। রাজ্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৩ মাইল এবং রাজধানীও এক মস্ত শহর। এখানকার লোকরা সহজে রেগে যায়, আবার শীঘ্রই ক্ষমা করতেও জানে। কোনও সেনাপতি যুদ্ধে হেরে গেলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না, শুধু লজ্জা দেবার জন্য স্ত্রীলোকের কাপড় পরতে দেওয়া হয়।

এই চালুক্যদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দক্ষিণের পল্লভরা। হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণকালে পল্লভ রাজা ছিলেন নরসিংহবর্মা। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্ম ও শিল্প-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পল্লভ রাজধানী কাঞ্চী। চালুক্য রাজাদের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ চললেও পল্লভ রাজত্বে শিল্পকলার আশ্চর্য উন্নতি হয়। হিউয়েন সাঙ কাঞ্চীর পল্লভ রাজার বিশেষ প্রশংসা করে গেছেন।

দুই ঃঃ হর্ষোত্তর যুগ ঃ হর্ষবর্ধনের যুগ শেষ হলে উত্তর ভারত কতকগুলি ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময়ে কোনও কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য ছিল না। ছোট রাজ্যগুলি প্রধানতঃ রাজপুত গোষ্ঠীর। তাদের মধ্যে শিশোদিয়া, চহমান (চৌহান), প্রতীহার (পরিহার), রাঠোর, সোলাঙ্কি, চেদি ও চান্দেল্ল প্রভৃতি বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের কয়েকজন রাজা ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন যেমন লক্ষ্মীকর্ণ, মুঞ্জ, ভোজরাজ, গোবিন্দচন্দ্র ও বীর পৃথ্বিরাজ। অনেকেই দুর্ধর্ষ তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। তাঁদের উৎসাহে সাহিত্য ও শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। চান্দেল্ল রাজাদের আমলে খাজুরাহোতে যে অপূর্ব সুন্দর মন্দিরগুলি তৈরী হয়, যেমন কাণ্ডারিয়া মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির, তাদের আশ্চর্য শিল্পরূপ ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষ প্রমাণ

করে। আবু পর্বতের প্রসিদ্ধ দিলওয়ারা মন্দিরের ভিতরে ছাদে ও অলিন্দে এই যুগের জৈন শিল্পকলার অপরূপ সূক্ষ্ম কাজ দর্শককে মুগ্ধ বিস্মিত করে।

কিন্তু এই সব রাজ্যগুলির একতার একান্ত অভাব ছিল, এদের সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল সামন্তধর্মী। এক একটি ছোট 'ক্যান' বা গোষ্ঠি রাজ্য সামন্ত সর্দারদের নিয়ে গঠিত ছিল। রাজার বংশ গৌরব আর নেতৃত্বের জন্য অনুগত অনুচরদল তাঁকে খুব সম্মান করত, বাধ্যতা দেখাত। এরা ছিল সাহসী বীর, যুদ্ধই যাদের জীবন ও জীবিকা। দেশ সম্বন্ধে তাদের বিশেষ ধারণা ছিল না, আপন গণ্ডীর মধ্যেই তারা বাস করত। আর এই ক্ষুদ্র সমাজে সকলের নীচে ছিল দরিদ্র কৃষকদল যাদের কোনও সংস্থান ছিল না।

উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতে খ্রীষ্টীয় নবম থেকে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত এই রকম পরিস্থিতি ছিল। বিশাল গড় বা দুর্গ নির্মাণ, সর্দারদের নেতৃত্ব, প্রভুভক্তি, আশ্রিতদের রক্ষা, রমণীর সম্মান, প্রবল আত্মমর্যাদা, মুসলমানদের প্রতিরোধ—এই ছিল রাজপুত গোষ্ঠীর চরিত্র ও বিশেষত্ব। তেমনি আবার সামন্তসমাজের যা কুফল, সেই পরস্পর কলহে আর গৃহযুদ্ধে ছোট রাজ্যগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমে মুসলিম শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে এদের বীরত্বের কাহিনী গাথা-সঙ্গীতে অমর হয়ে আছে। মনে হয় যেন য়ুরোপের সেই 'ফিউডাল' বা সামন্ত-সমাজের 'শিভ্যলরি' যুগের ছবি। এই সামন্তযুগের দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রমাণ হয়, যখন দেখি বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিয়ে একটি বড় ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন করতে চেষ্টা করছে কিন্তু বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। এমনি এক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করছি। উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করে এই সময়ে গুর্জর প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট ও পাল রাজবংশের মধ্যে এক বিশাল সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর ভারতের আধিপত্য এবং সেইজন্য পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতের তিনটি শক্তিশালী রাজ্য ত্রিকোণ-আকার লড়াই চালিয়েছিলেন। কেউই স্থায়ীভাবে কনৌজ অধিকার করে সাম্রাজ্য রাখতে পারেন নি। বহু দিন ধরে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। কখনও এক পক্ষ জয়ী হয়, আবার কখনও বিপক্ষের কাছে পরাজিত হয়। এইভাবে ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসা হয় নি, বরং তিনটি রাজবংশেরই অবনতি ও পতন সুরু হয়। তাদের বিস্তৃত রাজ্যগুলিতে সামন্ত রাজারা ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে।

এই সূত্রে ঐ তিনটি রাজ্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাজা ও তাঁদের রাজধানীর নাম জেনে রাখো। গুর্জর-প্রতীহারদের রাজধানী ছিল ভিনমাল, রাষ্ট্রকূটদের মানখেত, আর বাংলায় পাল রাজাদের পাটলিপুত্র। প্রায় একশো বছর ধরে যাঁরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা হলেন গুর্জর-প্রতীহার বংশের বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মিহিরভোজ ও প্রথম মহেন্দ্রপাল ; রাষ্ট্রকূট বংশের ধ্রুব নিরুপম ও তৃতীয় গোবিন্দ আর পালবংশের ধর্মপাল ও দেবপাল। চান্দেল্ল রাজা কখনও এপক্ষে কখনও ওপক্ষে যোগ দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি চেষ্টায় থাকতেন। বাংলার পাল রাজাদের কথা আবার পরে বলা হবে। তবে প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজ সম্বন্ধে

দু একটি কথা বলা দরকার। ইনিই তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর বহু উপাধি যুক্ত বিস্তর মুদ্রা থেকে তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও দীর্ঘ রাজত্বের কথা বোঝা যায়। তিনি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং 'আদি বরাহ' ও 'প্রভাস' নাম ধারণ করেন। গুর্জর-প্রতীহার রাজ্যে সুলেমান ও মাসুদি নামে দুজন পর্যটক এসে রাজাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল এবং দেশে শান্তিরক্ষার প্রশংসা করে যান। বিখ্যাত কবি রাজশেখর এঁদেরই রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন।

তিন ঃঃ মধ্য যুগে বাংলা ঃ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ আর 'বাংলাদেশ' মিলে যতটা আয়তন, প্রাচীন বাঙলা তার চেয়েও কিছু বড় ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণে ও পূর্বে সমতট হরিকেল প্রভৃতি অনেকগুলি জনপদ ছিল। তা ছাড়া, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। গুপ্তদের পতনের বেশ কিছুকাল পরে বাঙলায় স্থানীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শশাঙ্ক হলেন বাঙলার প্রথম স্বাধীন ও প্রতাপশালী রাজা।

শশাঙ্ক ঃ শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। কেবল তিনি যে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের অধীনে একজন বড় সামন্ত ছিলেন, এ কথা অনুমান করা যায়। তাঁর রাজ্যকাল আরম্ভ হয় আন্দাজ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙামাটি নামক জায়গায়। সমস্ত গৌড়ের উপর তাঁর আধিপত্য ছিলই, তার উপর দক্ষিণে মেদিনীপুর অঞ্চল (দণ্ডভুক্তি), ওড়িশা (উৎকল) এবং গঞ্জাম জেলায় কঙ্গোদ রাজ্যও তিনি জয় করেন। পশ্চিম দিকে মগধ রাজ্যও তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। এ কথা সত্য, শশাঙ্কের আগে বাঙলার কোনও রাজার এতটা শক্তি ও প্রতিপত্তি হয়নি।

একটি বড় রাজ্য স্থাপন করে শশাঙ্ক কনৌজে মৌখরিদের দমন করতে অগ্রসর হলেন। মৌখরি রাজা গ্রহবর্মার পরাজয়, থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে দেবগুপ্তের যুদ্ধ, শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু—এ সব কথা আগেই পড়েছ। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে রাজ্যবর্ধনের হত্যার জন্য দায়ী করেছেন, তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মের ঘোর শত্রু বলেছেন। এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা শক্ত, পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখিয়েছেন, হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধের পরও শশাঙ্কের স্বাধীন প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং রাজত্বও নষ্ট হয়নি। মোট কথা শশাঙ্কই হলেন বাঙলার প্রথম বড় স্বাধীন রাজা, যিনি বুদ্ধিতে ও বাহুবলে বাঙলা বিহার ওড়িশায় প্রভুত্ব বিস্তার করে অনেক বছর রাজত্ব করে যান।

শশাঙ্কের পর বাঙলাদেশ আবার অনেক ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং এই সময়ের ইতিহাস জানা যায় নি। বাঙলার ইতিহাসে এটি একশ' বছর ব্যাপী অন্ধকার যুগ। রাজাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ আর শত্রুদের আক্রমণের ফলে বাঙলাদেশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এই অরাজক অবস্থাকে সংস্কৃতে **'মাৎস্য-ন্যায়'** বলা হয়। তার মানে, পুকুরে বড় বড় মাছ যেমন ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলে, নৈরাজ্যের সময় প্রবলরা তেমনি দুর্বলদের

উপর অত্যাচার চালায়। এই সঙ্কটকালে দেশের প্রধান ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ একত্র হয়ে গোপাল নামে এক যোগ্য দলপতিকে রাজা নির্বাচিত করেন, যাতে এই অরাজকতার অবসান হয়। গোপালদেব সাধারণ বংশে জন্মেছিলেন, কিন্তু নিজগুণে বাঙলার শান্তি-শৃঙ্খলা এনে তিনি একটি দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মপাল ঃ গোপালের পর তাঁরই ছেলে ধর্মপাল সিংহাসনে বসেন। ধর্মপাল বাঙলার সীমা ছাড়িয়ে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চল জয় করেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই পশ্চিমে গুর্জরপ্রতীহার ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট বংশের সঙ্গে বাঙলার পাল রাজাদের বহুদিন ধরে ত্রি-শক্তির লড়াই চলে। ধর্মপাল কনৌজের রাজা (গুর্জরদের মিত্র) ইন্দ্রায়ুধকে হারিয়ে দিয়ে নিজের বশ্য মিত্র চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এই কীর্তি স্মরণীয় করবার জন্য তিনি এক বিরাট দরবার করেন যেখানে মৎস্য ভোজ মদ্র অবন্তী গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা উপস্থিত হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তার এই প্রতিপত্তি স্থায়ী হয়নি। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব (নিরুপম) এবং তৃতীয় গোবিন্দ ধর্মপালকে নাকি আর এক যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। তারপর প্রতীহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট কনৌজে আবার নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

দেবপাল ঃ ধর্মপালের ছেলে দেবপাল হলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়। গরুড়স্তম্ভ লিপিতে বলা হয়েছে, দেবপাল উৎকল (ওড়িশা), দ্রাবিড়, হূন, গুর্জর প্রভৃতি জাতির গর্ব খর্ব করেন। তিনি বাঙলার সীমান্ত কামরূপ ও ওড়িশা জয় করেছিলেন। দেবপালের খ্যাতি সাগর-পারেও পৌঁছেছিল। সুমাত্রা-যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র-বংশীয় মহারাজা বালপুত্রদেব দেব-পালের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। নালন্দা মহাবিদ্যাপীঠে বালপুত্রদেব একটি মঠ তৈরি করিয়ে দেন, তারই খরচের জন্য দেবপালের নিকট তিনি পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা করাতে দেবপাল সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গেরে) দেবপালের একটি বড় শিবির-গৃহ ছিল। বৌদ্ধ হলেও তিনি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অনাদর করতেন না। জানা যায়, গর্গদেব ও দর্ভপাণি নামে তাঁর দু-জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। দেবপালের রাজত্বে বাঙলার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হয়। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হলে বাঙলার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমতে থাকে।

সেন বংশ ঃ পালবংশ প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেন। তারপর সেন বংশ নামে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এঁরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের লোক। সেন বংশের প্রথম রাজা বিজয়সেন পালবংশের শেষ রাজাকে হারিয়ে সমস্ত বাংলা মিথিলা ও কামরূপ জয় করেন। তাঁর ছেলে বল্লালসেনের আমলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ), বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ), মিথিলা (উত্তর বিহার), ও বঙ্গ (বাগড়ি), এই কয় ভাগে বিভক্ত ছিল। বল্লালসেন রাজা হিসাবে তো বটেই, পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী বলেও বাংলার ইতিহাসে সুপরিচিত। নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায়

'অদ্ভুতসাগর' নামে একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই ও 'দানসাগর' নামে একটি স্মৃতি-শাস্ত্রের বই তিনি লিখেছিলেন আর হিন্দু সমাজ সংস্কারের জন্য তিনি বাংলার ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কুলীন-প্রথা প্রচলন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

পাল ও সেন যুগে সাহিত্য ঃ পালদেব আমলে লুইপাদ কাহ্নপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ গুরুদের লেখা চর্যাপদগুলি সবচেয়ে পুরানো বাঙলা ভাষার নমুনা। পণ্ডিতরা বলেন এই সব বৌদ্ধ দোহা ও গান থেকেই আমাদের বৈষ্ণব ও বাউল গানের উৎপত্তি। পাল যুগে বাঙলার অনেক বড় পণ্ডিত ও লেখক জন্মেছিলেন। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার কথা বলি। পাল রাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে সংস্কৃত শ্লোক থেকেই তা প্রমাণ হয়। দেব-পালের মন্ত্রী দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আর এক দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত হলেন শ্রীধরভট্ট, এঁর নিবাস ছিল ভুরসুট গ্রামে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্ত, বঙ্গসেন ও ধর্মশাস্ত্রেও কয়েক জন বাঙালী পণ্ডিত লেখকের পরিচয় পাওয়া গেছে। আর কাব্যরচনায় একমাত্র বড় কবি হলেন সন্ধ্যাকর নন্দী, যাঁর লেখা 'রামচরিত' একাধারে কাব্য ও ইতিহাস।

মনসাদেবীর মূর্তি (আঃ এগারো শতক)

সেন যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ও প্রসার হয়েছিল। বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেনের রচনার কথা আগেই বলা হয়েছে। শরণ, গোবর্ধন, উমাপতি ধর, 'পবন-দূত কাব্যের কবি ধোয়ী আর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের অমর কবি জয়দেব, এঁরা ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন। পরমবৈষ্ণব জয়দেবের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনা যায়। একবার নাকি একটি শ্লোকের চরণ লিখতে না পেরে স্নান করতে যান। ফিরে এসে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ নিজে বাকি পদগুলি পূরণ করে রেখেছেন। এই জয়দেব

শুধু সংস্কৃত কবি নন, সারা ভারতেও শেষ বড় সংস্কৃত কবি। লক্ষণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ছিলেন সে যুগের সব চেয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর দুই দাদা ঈশান ও পশুপতি হিন্দুদের আচার পদ্ধতির ওপর বই লেখেন। আর এক নামকরা পণ্ডিত ছিলেন সর্বানন্দ।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম ঃ পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক কাজ করেছেন। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিহারে তাঁরা নানা ভাবে সাহায্য দেন। সোমপুর, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার মহাবিহারগুলি তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহীর কাছে পাহাড়পুরে সোমপুরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মহারাজ ধর্মপালের আর এক নাম 'বিক্রমশিলদেব' অর্থাৎ তিনিই বিক্রমশিলা বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমশিলায় কয়েকজন বড় আচার্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঙলা দেশের পণ্ডিত শান্তিপদ ও তাঁর ছাত্র দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশের নাম চির প্রসিদ্ধ। অতীশের জন্ম গৌড়ের এক রাজ-পরিবারে ; বাবার নাম কল্যাণশ্রী, মার নাম প্রভাবতী। বৌদ্ধপণ্ডিত শীলরক্ষিতের কাছে তাঁর দীক্ষা। সিংহল প্রভৃতি নানা জায়গায় শিক্ষালাভ করে তিনি রাজা মহীপালের আমন্ত্রণে বিক্রমশিলার আচার্যপদে বসেন। তারপর তিব্বতের রাজার একান্ত অনুরোধে তিনি তিব্বতে গিয়ে তেরো বছর কাল বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও প্রচার করে সেখানেই মারা যান। এই সব যোগাযোগের ফলে নেপাল তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম ও শিল্পের ওপর বাঙলার বিশেষ প্রভাব পড়ে।

তবে ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ হয়েও পাল রাজারা যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তার প্রমাণ তাঁদের শাসনলিপি। সেগুলিতে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম আর পাশুপত মন্দির প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। পালযুগে যত দেবতার মূর্তি পাওয়া যায়, তার মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর সংখ্যাই বেশি। সেন আমলে অবশ্য ব্রাহ্মণসমাজ ও সংস্কৃতির বহুল প্রসার হয়। বিশেষ করে বল্লালসেন ও লক্ষণসেনের হিন্দু আচারের প্রতি অনুরাগ এবং তাঁদের রাজত্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লেখা নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সে কথা স্পষ্টই বোঝা যায়।

প্রজ্ঞাপারমিতা—সন্ধ্যাকর নন্দীর পুঁথির পাতা থেকে

বাণিজ্য ও শিল্প ঃ এই যুগে বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, এখানে জলপথ ও স্থলপথ মিলেছে আর অনেক দুষ্প্রাপ্য দামী মাল এখানে জমা হয়। তাম্রলিপ্ত থেকে অনেক ভারতীয় জাহাজ সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর চীনজাপানেও যাতায়াত করত। বাঙালী নাবিক ও বণিকদলের সাহসে ও চেষ্টাতেই দেশের সম্পদ বাড়ে। এ সময়ে বাঙলার কৃষিবাণিজ্য ও

শিল্পের অবস্থা ভালোই ছিল। পাথর ও পোড়া মাটির ওপর কাজে বাঙালী শিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। স্তূপ ও বিহারের মধ্যে যে সব সুন্দর পাথরের কাজ ও মূর্তি পাওয়া গেছে, সেই ছবিগুলি দেখলে শিল্পকাজের নমুনা বুঝতে পারবে। অনেক নিপুণ শিল্পীর নাম আমরা জানতে পেরেছি, যেমন ধীমান ও তাঁর ছেলে বীতপাল তাঁরা পাথর ও ধাতু দিয়ে মূর্তি গড়তেন। শঙ্খদাস, বিমলদাস, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি আরও বাঙালি শিল্পী ছিলেন। রাজা রামপালের সময়ের পুঁথিতে অনেক সুন্দর ছবি আঁকা আছে।

সমাজ জীবন ঃ পাল ও সেন আমলে ভূস্বামী ও বড় গৃহস্থদের অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সাধারণ চাষী ও শ্রমিকদের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না মনে হয়। এ যুগের 'চর্যাগীত' গুলিতে গরীব সমাজের অভাব-দৈন্যের ছবি পরিষ্কার ফুটেছে। সেকালে অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী কৃষিজীবি। বাঙলায় তখন আখ, তুলো, সর্ষে, পান ও অনেক রকম ফলের চাষ হত। বহু দূরদেশেও বাঙলার তৈরী সুতির কাপড়ের খুব আদর ছিল। কামার, কুমোর, তাঁতি, স্যাকরা, শাঁখারী প্রভৃতি কারিগরদের নিজস্ব সংঘগুলি পরে 'জাতি' হিসাবে পরিচিত হয়। বাঙালীদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক, ফল, দুধ ও দুধের তৈরী জিনিস। ব্রাহ্মণরা আমিষ খেতেন এবং রুই ও ইলিশ মাছের খুব প্রচলন ছিল। পুরুষের বেশ মালকোঁচা দিয়ে খাটো ধুতি, মেয়েদের পরনে গোড়ালী-ঢাকা শাড়ী। অলঙ্কারের মধ্যে নারী ও পুরুষ কানে কুণ্ডল, গলায় হার পরতেন। পুরুষদের কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল, মেয়েদের হাতে শাঁখা, মাথায় নানা ছাঁদের খোঁপা। মেয়েরা সিঁদুর, আলতা, কুঙ্কুম ব্যবহার করতেন।

নানা রকম খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল। পাহাড়পুরের মূর্তিতে ঢাক ঢোল বাঁশী ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়। পুরুষরা কুস্তি, শিকার ও বাজিকরের খেলা পছন্দ করত। যানবাহন বলতে সাধারণ লোক চড়ত নৌকা ও গরুর গাড়ি, বড়লোকরা ব্যবহার করত হাতী, ঘোড়া ও রথ। বিয়ের পর নতুন বৌ গরুর গাড়ী করে শ্বশুরবাড়ী যেত। মোটামুটি বলা যায়, সেকালের বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে একালের বেশি গরমিল নেই। হিউয়েন সাঙ বাঙলার নানা অঞ্চল ঘুরে ও দেখে বাঙালীদের স্বভাব-চরিত্রের সুখ্যাতিই করেছেন। বলেছেন, বাঙালী ছাত্ররা বুদ্ধিমান ও বিদ্যায় অনুরাগী, দোষের মধ্যে একটু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ। কিন্তু কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন, গৌড়ের ছাত্ররা দেখতে ক্ষীণ হলেও উদ্ধত, দোকানদার দাম চাইলে দাম না দিয়ে ঝগড়া মারামারি করে। যাই হোক, সহজে উত্তেজিত, তর্কপ্রিয় বলে সেকালের বাঙালীর একটু অখ্যাতি ছিল মনে হয়। আর সমাজে কিছু কিছু যে খারাপও ছিল, পুরনো সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে।

চার ঃঃ দক্ষিণ ভারতের কথা ঃ দক্ষিণ ভারতের দুটি অংশ ; উপর দিকে দাক্ষিণাত্য আর নিচের অংশটি সুদূর দক্ষিণ। পাণ্ড্য রাজ্য ছিল সব চেয়ে দক্ষিণে, রাজধানী ছিল মাদুরা। তারই উত্তরে বর্তমান তিরুচিরপল্লী আর তাঞ্জোর নিয়ে চোল

রাজ্য গঠিত ছিল। এই অঞ্চল হল প্রাচীন তামিল দেশ। এর উত্তরে হল কাঞ্চীর পল্লভ এবং পল্লভদের সমকালীন চালুক্য রাজ্য।

পল্লভ বংশ ঃ প্রথমে পল্লভদের কথা বলি। এদের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন বিষ্ণুগোপ সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে যাঁর যুদ্ধ হয়। বিষ্ণুগোপের পরে প্রায় দু'শ বছরের ইতিহাস অন্ধকার, কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায় মাত্র। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সিংহবিষ্ণু পল্লভদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারপর থেকে ইতিহাস মোটামুটি ধারাবাহিক। মহেন্দ্রবর্মা ও প্রথম নরসিংহবর্মা পল্লভ রাজ্যের আয়তন ও গৌরব বাড়িয়েছিলেন। মহেন্দ্রবর্মার সময়ে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ পল্লভ-চালুক্য সংঘর্ষ সুরু হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ বহু বছর ধরে চলেছিল। কিছুকাল যুদ্ধ বিরতি, তারপর আবার প্রবল লড়াই সুরু। মহেন্দ্রবর্মা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হেরে যান, কিন্তু মহেন্দ্রবর্মার ছেলে পরাক্রান্ত নরসিংহবর্মা তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

নরসিংহই পল্লভ বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত রাজা। দক্ষিণে তামিল প্রদেশ এবং পাণ্ড্য কেরল চোল প্রভৃতি রাজ্যের উপর তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এইটিই পল্লভ রাজত্বের তুঙ্গস্থান। তাঁরই সময়ে মহাবলিপুরম্ নগরে পাথরে শিল্পকাজ ভারতের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। কাঞ্চী ছিল পল্লভদের রাজধানী। এখনও হিন্দুদের কাছে এটি পবিত্র তীর্থস্থান বলে গণ্য। নরসিংহবর্মার পরে চালুক্যরা আবার তাঁদের নষ্ট গৌরব উদ্ধার করেন। পল্লভ রাজা নন্দিবর্মা চালুক্য রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের কাছে পরাস্ত হন। এর পর থেকে পল্লভদের অবনতি সুরু হয়। শেষ আঘাত হানল রাষ্ট্রকূটরা। চালুক্যদের বাতাপি নগর ধ্বংস হয়ে এখন জনহীন, কিন্তু পল্লভদের কাঞ্চী শহর আজও সগৌরবে বর্তমান।

চালুক্য বংশ ঃ চালুক্যরা নিজেদের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতেন। এই বংশের রাজা প্রথম পুলকেশী বাতাপি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁরই পৌত্র চালুক্য কুলতিলক দ্বিতীয় পুলকেশী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সংঘর্ষ, সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় পশ্চিমে, পূর্বে আর সুদূর দক্ষিণে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাটে। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সময় হিউয়েন সাঙ 'মো-হা-লা-চ' অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশের এই বীর রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কীর্তিকথা এবং তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর সময়ে অজন্তা গুহায় কয়েকটি চিত্র আঁকা হয়। বলা হয়, পারস্য রাজ্যের সঙ্গে তিনি দূত বিনিময় করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের কথা তোমরা আগেই পড়েছ। পণ্ডিতরা মনে করেন, ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পুলকেশীই হর্ষকে হটিয়ে দেন, হর্ষ তাঁকে হারাতে পারেননি।

কাঞ্চীর রাজা মহেন্দ্রবর্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করার কথাও আগে বলেছি। তবে শেষ জীবনে পুলকেশীর দুর্ভাগ্য ঘনায়। পল্লভরাজ নরসিংহবর্মার হাতে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী নগর দখল করে পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। এর পরে আরও প্রায় একশো বছর পল্লভ-চালুক্য সংঘর্ষ চলে।

অবশেষে চালুক্য বংশের শেষ বড় রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ নন্দিবর্মাকে হারিয়ে দিয়ে কাঞ্চী অধিকার করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকুট রাজা দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করলে ক্রমে চালুক্যদের গৌরব নষ্ট হয়ে গেল। তবে একটি বিষয়ে পল্লভ-চালুক্য-রাষ্ট্র-কূটদের মধ্যে মিল ছিল। তিনটি রাজবংশই শক্তির ও শিবের উপাসক ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে অনেক শিব-মন্দির আর দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া যায়। অবশ্য বিষ্ণুর উপাসনাও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল তামিলদেশে। কাঞ্চী নগরই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শহরের মধ্য দিয়ে রাস্তা, তার একধারে রয়েছে শিবকাঞ্চী, অপরদিকে বিষ্ণুকাঞ্চী।

পূর্ব ভারত গঙ্গা ও গোদাবরীর মধ্যে ওড়িশায় আর একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। সেখানে গঙ্গবংশ রাজত্ব করতেন। অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজা। তাঁর সময়ে ওড়িশার মন্দির শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। গঙ্গবংশের পতন হলেও ওড়িশায় বহুদিন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল।

চোল রাজ্য ঃ পল্লভদের পতনের পর সুদূর দক্ষিণে চোল রাজ্যের উত্থান হয়। জলে ও স্থলে, উভয় দিকেই এঁদের পরাক্রম ছিল। রাজরাজই প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা যিনি বাহুবলে সিংহলের কিছু অংশ, পশ্চিম দিকে মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ জয় করেন। তাঁর সময় চীন দেশে দূত পাঠানো হয়। রাজরাজের ছেলে রাজেন্দ্র (১০১৮-১০৪৩) এই বংশের সবচেয়ে বীর ও বড় রাজা। কল্যাণ ও কর্ণাট দেশ জয় করে রাজেন্দ্র চোলদেব মহীপালের রাজত্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন। নৌ-সৈন্যের বলে তিনি ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ আর সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয় রাজ্যও আক্রমণ করেন। 'গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম' নগরে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়। সমুদ্রপথে চোল প্রভাব বিস্তার তাঁরই কৃতিত্ব। পূর্বে ব্রহ্ম মালয় দেশ, পশ্চিমে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত তাঁর শক্তিশালী নৌবাহিনী ঘুরে বেড়াত। রাজেন্দ্রচোলের দৌহিত্র রাজেন্দ্র 'কুলোত্তুঙ্গ এই বংশের শেষ কীর্তিমান রাজা।

দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য ঃ সুদূর দক্ষিণ ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয়, সংকীর্ণ জায়গার ভিতর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য ছিল। প্রত্যেক রাজ্যই প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করতেন এবং রাজ্যের সীমাও নির্দিষ্ট থাকত না। তবে দাক্ষিণাত্যের সমাজ ও ধর্ম, শিল্প ও সভ্যতার বিশেষত্ব আছে। উত্তর ভারত থেকে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতি নিলেও দক্ষিণ ভারত মন্দির-শিল্পে ও মূর্তিগঠনে তার স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছিল। দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে গ্রামসমাজের স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, নৌ-বাণিজ্য আর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে তৈরি মন্দিরগুলির আশ্চর্য শিল্পকাজ। এ সব ক্ষেত্রেই চোলরা ছিলেন অগ্রণী। দোর্দণ্ডপ্রতাপ চোল রাজারা একদা বঙ্গোপসাগরকে 'চোল হ্রদে' অর্থাৎ নিজস্ব এলাকায় পরিণত করেন। চোল রাজারা শক্তিশালী হলেও পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মন্ত্রিদল আর সাধারণ প্রজাদের নিয়ে 'পঞ্চ মহাসভা'র মতামত মেনে চলতেন। এখানে দাসপ্রথা ছিল না, স্থায়ী সৈন্যদল বেতন পেত। দক্ষিণ ভারতে **সমাজের** ভিত্তি হল

গ্রাম। গ্রাম-সমাজের স্বাধীনতা চোলদের আমলে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। রাজা ছিলেন সকলের উপর। রাজ-কর্মচারীরা সব বিষয়ে তদারক করতেন বটে কিন্তু গ্রামের কর্তা ব্যক্তিদের পরিচালিত গ্রামসভার হাতে অনেক ক্ষমতা ছিল। এই সভার মধ্যে বিভিন্ন সমিতিগুলি এক একটি বিভাগের কাজ করে যেত। সব গ্রামবাসীরাই নির্বাচিত হয়ে সভ্য হতে পারতেন। জনসাধারণের এই রকম স্বাধীন অধিকার ভারতে আর কোথাও দেখা যায় নাই। গ্রাম শাসনের সুন্দর ব্যবস্থার ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্পষ্টই গণতন্ত্রের চেহারা ফুটে ওঠে।

শিল্প ও সংস্কৃতি ঃ গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু উত্তর ভারতের ইতিহাস নয়। দক্ষিণ ভারতে ধর্ম সমাজ ও সভ্যতার এক বিশিষ্ট রূপ বহু বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। যেখানে দিগ্‌জয়ী শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য, সায়ন ও মাধবাচার্যের মত মহাজ্ঞানী পণ্ডিত দার্শনিকদের জন্ম সেখানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধ রূপটি আজও বেঁচে আছে। এখানকার মন্দির, শিল্প, নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত ভারতের ইতিহাসে এক বড় নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

বইয়ের ছবিগুলি দেখতে দেখতে আর একটি কথা ভেবো। ইতিহাসে রাজা-রাজড়াদের কথাই আমরা শুনে থাকি। কিন্তু যারা পাথর কুঁদে ঐ সব অপূর্ব মূর্তি সৃষ্টি করল, গুহার গায়ে বিচিত্র রূপে বিভিন্ন ভঙ্গীতে যক্ষ-অপ্সরাদের মনোহর মূর্তি খোদাই করল, মন্দিরে কত কারুকাজ-করা স্তম্ভ, অলিন্দ বেষ্টনী রচনা করল ; সমুদ্রতীরে, দুর্গম গিরিগহ্বরে, নানা দেব দেবীর কল্পনাকে রূপ দিয়ে গেল, তারা কারা ? সাধারণ মানুষ, কিন্তু শিল্পীর জাত। এদের হাতেই ভারতীয় সভ্যতার সেরা পরিচয় যা দেখে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় এই নিপুণ শিল্পীরা কাজ করে বেড়িয়েছে এক রাজত্ব থেকে আর এক রাজত্বে। সেই অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা থেকে আইহোল, বাদামি, কালি, কাহ্নেরি ও ঘরপুরী দ্বীপের গুহাচৈত্য, ইলোরার পাহাড়কাটা মন্দিরে এবং মহাবলিপুরম, কাঞ্চী, চিদাম্বরম, মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতি নগরের দেবালয়গুলিতে তারা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

পল্লভ শিল্প ঃ সম্রাট অশোকই প্রথমে উত্তর ভারতে পাথরের ব্যবহার প্রচলন করেন। তার পরে সুঙ্গ ও কুশান যুগে এবং আরও পরে, গুপ্ত রাজাদের সময়ে প্রস্তরশিল্পের আশ্চর্য উন্নতি দেখা গেল। এর প্রায় পঁচিশ বছর পরে সুদূর দক্ষিণে প্রস্তরশিল্পের এক নতুন রূপ ও রীতি নিয়ে এলেন পল্লভরা। পল্লভ শিল্পের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই মহাবলিপুরমে। সেখানকার 'সপ্তরথের' কথা আগে বলতে হয়। দ্রৌপদী অর্জুন ভীম ধর্মরাজ ইত্যাদির নামে সাতটি রথের আকারে মন্দির আছে। এক একটি বিরাট শিলা থেকে এক একটি রথ তৈরি হয়েছে। আকারে বড় নয়, কিন্তু অল্প আয়তনের মধ্যে এমন সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য বিরল। এর পরে কৃষ্ণমণ্ডপ, সেখানে পাথরের উপর বিচিত্র দৃশ্য। এই বিশাল প্রস্তরচিত্রে গঙ্গাবতরণের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এখানে নর-নারী ও জীবজন্তুর মূর্তিগুলি এত জীবন্ত যে বিস্ময় জাগে। তারপর পঞ্চপাণ্ডব, ত্রিমূর্তি ও

আদি বরাহ গুহাগুলির মধ্যে কত বিচিত্র কাজ। আর আছে বিখ্যাত মহিষমণ্ডপ। এর মধ্যে পাহাড়ের গায়ে খোদিত মহিষাসুরমর্দিনীর অপরূপ মূর্তি। আর একটি মহিষমর্দিনী মূর্তিও পাওয়া যায়, যেখানে দেবীর মুখে কুমারী-ভাব, দাঁড়ানোর ললিত

ধর্মরাজের রথ, মহাবলিপুরম

ভঙ্গী দেখলে মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগে আইহোল চালুক্যদের দুর্গামন্দিরেও সিংহবাহন যুদ্ধরত দেবীমূর্তি আছে। কিন্তু তাঁর মুখে বিজয়িনীর উল্লাস ফুটে আছে।

মহাবলিপুরমের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে 'জল-শয়ন' মন্দির। সমুদ্রতীরে পাথরের ভিত্তির উপর মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে আর সাগরের ঢেউ উচ্ছ্বসিত ফেনায়

মন্দিরের পাদপীঠ ছুঁয়ে যাচ্ছে। সামনে অনন্ত সমুদ্র, উপরে অসীম আকাশ। এর অদ্ভুত শোভা ও গাম্ভীর্য কিছুক্ষণ দেখলে মন উদাস হয়ে যায়। রাস্তা থেকে মন্দিরে যাওয়ার পথে রয়েছে সিংহমূর্তি, যা পল্লভ শিল্পে খুব বেশি দেখা যায়।

চালুক্য শিল্প ঃ চালুক্য আর রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাস কেবল যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী নয়। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহ এবং সাহায্য করেছিলেন। অজন্তায় যদিও পুরোপুরি বৌদ্ধ শিল্প, ইলোরায় বৌদ্ধ গুহাচৈত্যের পাশাপাশি হিন্দু শিল্পেরও বহু নমুনা রয়েছে। যাই হোক, চালুক্য আমলের প্রথম দ্রষ্টব্য হল আইহোল। সেখানে গোলাকার দুর্গামন্দির আছে, যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। চালুক্যদের রাজধানী বাদামিতে অনেক গুহা এবং পাহাড়-কাটা মন্দির আছে। এই সব গুহাতে, মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, দেয়ালে নৃত্যরত শিবের প্রস্তরচিত্র, দালানের শেষে উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি, আর ব্র্যাকেটে শিবদুর্গা ও অপ্সরা মূর্তির মুখের ভাব ও দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে শিল্পের মহিমা বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া গুহার দেয়ালে, ছাদে, বারান্দায়, থামের মাথায় অজস্র সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ আছে।
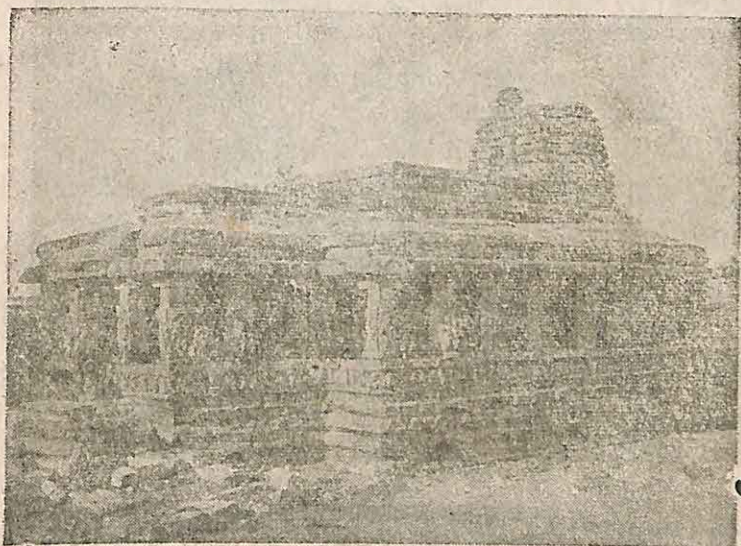
আইহোলের দুর্গামন্দির

বাদামির পরে এলিফান্ট গুহায় যে অপরূপ শিল্পকাজ আছে, তার কথা এখানে বলে রাখি। বোম্বাই-এর কিছু দূরে একটি পাহাড়ী দ্বীপে এই গুহামন্দির। সেখানে নানা মূর্তির মধ্যে মন্দিরের দ্বারপাল এবং রাজবেশে শিবের উল্লেখ করতেই হবে।

মহাদেবের তিনটি মুখে যে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, তা দেখে এক বিখ্যাত বিদেশী পণ্ডিত বলেছেন, যেন পাথরই গলে গিয়ে মহাদেবের ভাবরূপ হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রকূট শিল্প ঃ রাষ্টকূটদের সামরিক খ্যাতি ছিল কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের দান প্রচুর। ইলোরায় হিন্দু বৌদ্ধ গুহামন্দির ও মঠ পাশাপাশি বিরাজ করছে। তার মধ্যে কৈলাস মন্দিরই রাষ্ট্রকূটদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গুহার মধ্যে অর্থাৎ ছাদে বারান্দায় দেয়ালের গায়ে শিব-পার্বতীর বিবাহ-দৃশ্য, নটরাজ প্রভৃতি পাথরের চিত্রমূর্তিতে যে অজস্র শিল্প-কাজের নমুনা আছে, তা অবশ্য অনবদ্য সুন্দর। কিন্তু পাহাড় থেকে কাটা মন্দিরটির বিভিন্ন অংশে বিচিত্র সৌন্দর্য কেমন করে সম্ভব হল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একটি মূর্তি, রাবণ কৈলাস পর্বতকে নাড়া দিচ্ছেন, তার মধ্যে কি বলিষ্ঠ ভাব ফুটে উঠেছে। গুহার ভিতর পাথর কেটে এই ধরনের মন্দির বা চৈত্য নির্মাণ কম কৃতিত্ব নয়। সেই জন্য বলা হয়, দক্ষিণ-ভারতে যেমন একাধারে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের
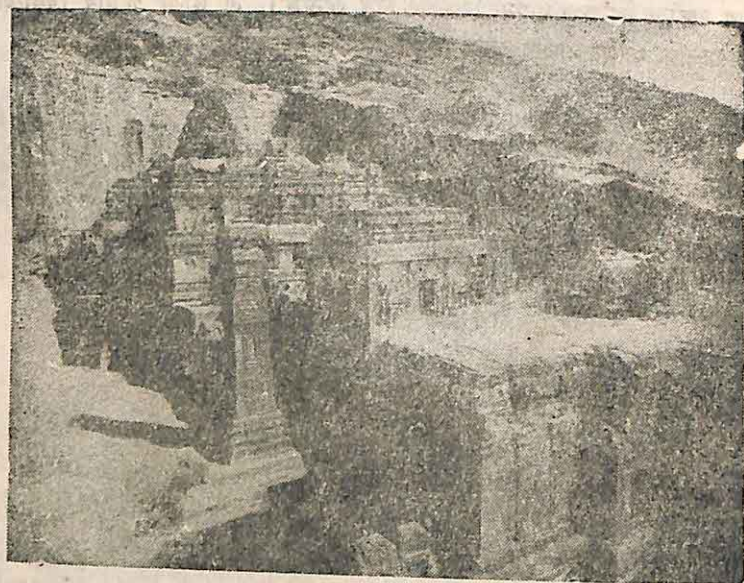
ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির

নিপুণ প্রকাশ দেখা যায় তেমন আর কোথাও নেই। তবে চীনের তুন হুয়াং প্রদেশে ঠিক এই সময়েই ঐ রকম পাহাড় কেটে মঠ তৈরি করার রীতি ছিল। সেখানকার সহস্র বুদ্ধের সঙ্গে অজন্তা গুহায় সহস্র বুদ্ধের আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

চোল শিল্প ঃ চোলদের আমল থেকে মন্দিরশিল্প পুরোপুরি হিন্দু। তাঁদের মত মহৎ শিল্পচর্চা দক্ষিণ ভারতে আর কোনও রাজবংশ এমন বিরাট ভাবে করেনি। পল্লভ শিল্প সীমার মধ্যে, সরল সুষমাময় চোল শিল্প বিশাল, অলঙ্কারে মণ্ডিত।

বৃহৎ প্রাঙ্গণ, জলাশয়ের মাঝখানে দীপমাণিক্য, দোকান-ঘেরা চত্বর আকাশ-ছোঁয়া বিরাট মন্দির-তোরণ বা 'গোপুরম' গুলির পিরামিড-আকার শোভা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আসল মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু অতি উচ্চ ঐ দৃপ্ত গোপুরমগুলিতেই চোলদের বিশেষত্ব ও শিল্পক্ষমতা ধরা পড়ে। তাঞ্জোর, চোলপুরম ও চিদাম্বরমের
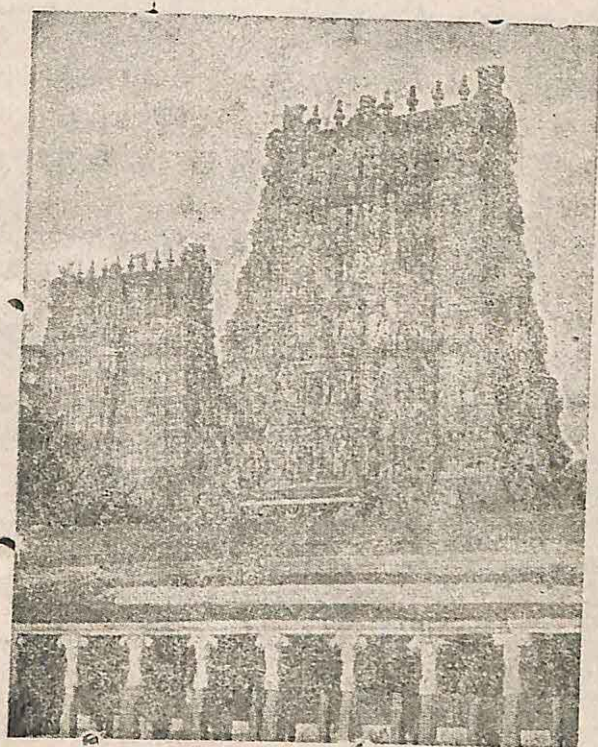
মাদুরাই মন্দিরের গোপুরম

মন্দিরগুলির কারুকাজ এবং অজস্র মূর্তি স্বচক্ষে না দেখলে চোল শিল্পের স্বরূপ বোঝা যায় না। বিখ্যাত শিল্পরসিক ফার্গুসন সাহেব বলেছেন, চোলরা শিল্পের পরিকল্পনায় যেন অতি-মানুষ আর সূক্ষ্ম রূপদানে নিখুঁত মণিকার। তা ছাড়া, চোল শিল্পের সব চেয়ে বিশিষ্ট নমুনা হল ঢালাই-করা ব্রোঞ্জের মূর্তি। নানা ভঙ্গীতে নটরাজের ধাতু-বিগ্রহ ও অন্যান্য মূর্তিগুলি সভ্য জগতে পরম সমাদর পেয়ে থাকে। অনেকেই বলেন, চোলদের নটরাজে ভারতের কল্পনা ও সৃষ্টি এক হয়ে মিশে গেছে।

ওড়িশার শিল্প ঃ এগারো শতকে ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরগুলি নিজস্ব রীতিতে তৈরি হয়। পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর, রাজা-রাণী ও লিঙ্গরাজ প্রভৃতি ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরগুচ্ছ ওড়িশার গৌরব। মুক্তেশ্বর যেন একটি নিটোল ছোট মুক্তা, এত সুন্দর তার গড়ন। আর রাজা-রাণী মন্দিরটি বোধ হয় সব চেয়ে সুন্দর গম্ভীর। পুরীতে জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দির তো জগদ্‌বিখ্যাত। তবে পুরীর কিছু দূরে কোনার্কের

নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্তি

সূর্যমন্দিরের গঠন ও ভাস্কর্য সত্যই অপরূপ। বারোটি চাকায় সাতটি ঘোড়ায় টানা এই রথাকৃতি মন্দির ওড়িশার মন্দিরশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কালো পাথরের ঘোড়া ও

হাতীর তেজস্বী ভঙ্গী দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করে। শূন্য বালিয়াড়ির মধ্যে পরিত্যক্ত এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরের লুপ্ত অতীত মনে চমক ও বিষাদ জাগায়।
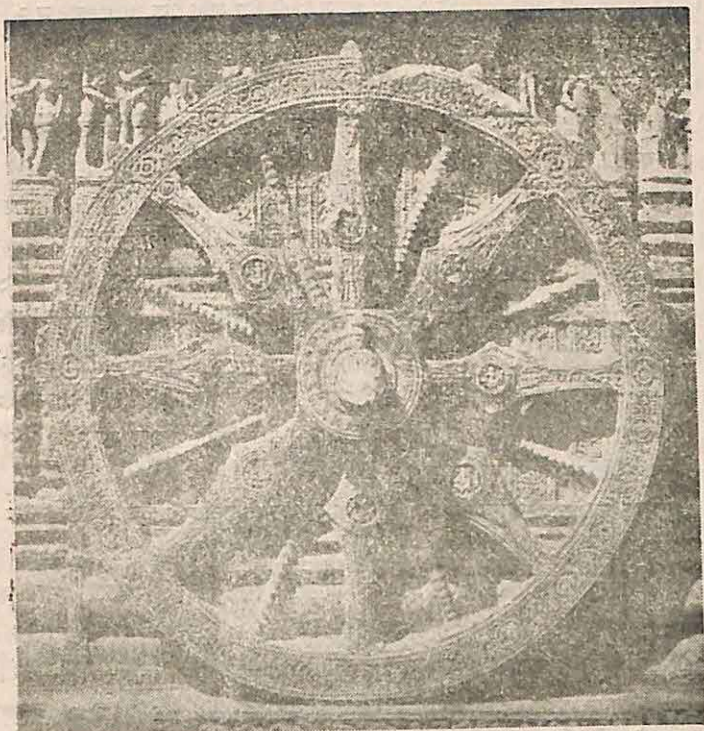
কোণার্কের মন্দিরের নিম্নাংশ

অনুশীলনী

১। হর্ষবর্ধন কোন বংশের রাজা? তাঁর রাজধানী ছিল কোথায়? মৌখরিদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ?
২। 'শীলাদিত্য' কার উপাধি? দেবগুপ্ত কে ছিলেন, কি করেছিলেন?
৩। হর্ষবর্ধনকে কি সমস্ত উত্তর-ভারতের সম্রাট বলা চলে?
৪। তাঁর শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল?
৫। হিউয়েন সাঙ কে? তিনি ভারতে কেন এসেছিলেন?

৬। মানচিত্রে হিউয়েন সাঙ এর ভ্রমণ পথ দেখাও। কোন কোন 'রাজ্যের ভিতর দিয়ে তিনি ভারতে আসেন?

৭। নালন্দা কি জন্য বিখ্যাত? সেখানে হিউয়েন সাঙ কি দেখেছিলেন?

৮। ভিক্ষু, সিদ্ধিবস্তু, দ্বারপণ্ডিত—শব্দগুলির মানে বল।

৯। হিউয়েন সাঙ 'মধ্যদেশের' অবস্থা সম্বন্ধে কি বলেছেন?

১০। চালুক্যদের সৈন্যবল ও সাহস সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ কি মন্তব্য করেছেন?

১১। কাঞ্চী কোথায়? সপ্তরথ কি ও কোথায় অবস্থিত?

(ক) হর্ষবর্ধনের পর উত্তরভারতের কিরূপ অবস্থা ছিল? (খ) কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের নাম বল। (গ) খাজুরাহো কি জন্য বিখ্যাত? এই যুগে গোষ্ঠী রাজ্যগুলির কি কি চরিত্র ও বিশেষত্ব? (ঙ) মধ্য যুগে য়ুরোপের সামন্ত সমাজের সঙ্গে এই সময়ে ভারতের অবস্থার কি মিল দেখা যায়? (চ) ত্রিশক্তির লড়াই কাদের মধ্যে হয়েছিল? তার কি কোনও সমাধান হয়েছিল? (ছ) মিহিরভোজ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কেন? (জ) বৎসরাজ, তৃতীয় গোবিন্দ, দেবপাল কোন বংশের রাজা? (ঝ) সুলেমান ও মাসুদি কখন ভারতে আসেন? তাঁরা কি বলেছেন? (ঞ) সামন্ত সমাজের দুর্বলতা কি? ভারতে তার কুফল কি হয়েছিল?

১২। পল্লভ ও চালুক্যদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ হয়েছিল কেন? তার কি ফল হয়েছিল?

১৩। এঁরা কোন বংশের রাজা ও কি কারণে বিখ্যাত? দ্বিতীয় পুলকেশী, নরসিংহবর্মা, রাজেন্দ্র।

১৪। **এদের সম্বন্ধে কি জান দুচার কথায় বল**ঃ—গীতগোবিন্দ, ধোয়ী, চর্যাপদ, পাহাড়পুর, শ্রীজ্ঞান, ধীমান, তাম্রলিপ্ত।

১৫। **এইগুলি কি, কোথায় ও কি জন্য প্রসিদ্ধ।**

মহাবলিপুরম, কাঞ্চি, আইহোল, বাদামি, ইলোরা, তাঞ্জোর, ভুবনেশ্বর, কোনার্ক।

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। শশাঙ্ক কি কারণে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ?

২। শশাঙ্ককে কে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলেছেন?

৩। শশাঙ্কের পর বাংলার কি অবস্থা হয়েছিল?

৪। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ঐ বংশের দুজন বড় রাজার নাম বল।

৫। পাল রাজাদের সঙ্গে কাদের ও কেন 'ত্রিকোণ' যুদ্ধ হয়?

৬। পাল রাজারা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? তাঁরা যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অনাদর করেন নি, তার কি প্রমাণ আছে?

৭। সেন আমলে কোন ধর্ম রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল?

৮। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বে চারজন পণ্ডিত ও কবির নাম কর এবং তাঁদের লেখা বইয়ের উল্লেখ কর।

৯। পাল ও সেন রাজত্বে বাঙালীর আহার জীবিকা, বেশ ভূষা ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কি জেনেছে ?

১০। পাল ও সেন যুগে বাংলায় কোন কোন শিল্পকলার উন্নতি হয় ?

১১। ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা কোথায় ? সেখানে কি ছিল ?

ভুল থাকলে ঠিক উত্তর দাও ঃ

(ক) হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাস্ত করেন।

(খ) বাণভট্ট তিনখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

(গ) শ্রীহর্ষ নামে এক কবি 'হর্ষচরিত' লেখেন।

(ঘ) প্রয়াগে হর্ষবর্ধন একটি বড় ধর্ম সভার আয়োজন করেন।

(ঙ) কনৌজ দানমেলা-অনুষ্ঠানে হর্ষবর্ধন সোনার বুদ্ধমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করতেন।

(চ) নালন্দায় প্রধান আচার্য ছিলেন ধর্মপাল।

(ছ) উত্তর ভারতে ভ্রমণকালে হিউয়েন সাঙ কোনও বিপদে পড়েন নি।

(জ) চালুক্য নৃপতি নরসিংবর্ম বীর যোদ্ধা ছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারত ও বহির্জগৎ

ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা : ভারতের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বহু যুগ ধরে চলে আসছে। সম্রাট অশোকের আমল থেকেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সুরু হয়। এই সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল বেশির ভাগ বাণিজ্য আর খানিকটা ধর্মপ্রচারের সূত্রে। সেইসূত্রে ভারতীয় ধর্ম শিল্প ও সভ্যতা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রত্যক্ষ চিহ্ন এখনও দেখা যায়, ঐতিহাসিক প্রমাণ তো আছেই। এই বার প্রাচীন ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চল বা রাজ্যগুলিতে কেমন করে ভারতের সংস্কৃতি পৌঁছল, তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা আর নতুন দেশ দেখার আগ্রহ, এই দুটি কারণে অনেক ভারতীয় সাগরপারে গিয়ে এক একটি জায়গায় বসবাস সুরু করেন। তারপর সেই সব বসতি থেকে অঞ্চল বিশেষে কয়েকটি রাজ্য গড়ে উঠল। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা ভারতের ধর্ম ও সভ্যতাকে কাছে পেল, এবং নিজ নিজ আচার-সংস্কারের সঙ্গে সেগুলি মিশিয়ে এক একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা সৃষ্টি করল। উত্তরে কুশান গুপ্ত ও পাল বংশ আর দক্ষিণে পল্লভ চোল প্রভৃতি রাজাদের আমলে, দু-দিক দিয়ে ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। একটি হল **স্থলপথে** মধ্য এসিয়া, তিব্বত, চীনের দিকে। এই অঞ্চলটিকে বলা হত 'ইণ্ডিয়া মাইনর' বা ক্ষুদ্র ভারত। আর দ্বিতীয়টি **জলপথে,** দক্ষিণ এসিয়ার দিকে অর্থাৎ ব্রহ্ম, সিংহল, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) মালয় ও ইন্দোচীন অঞ্চলে (সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে)। সাগরপারে ঐ সব হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্যগুলিকে এক সময়ে একত্র ভাবে বলা হত 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া' বা বৃহত্তর ভারত। তার কারণ, ভারতবাসীরা মনে করতেন যে ঐ সব দূরদেশের রাজা প্রজা সকলে মিলে যেন একটি বৃহত্তর ভারতেরই অঙ্গ। এই ধারণার বশে আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভারতীয় শিল্পকলার অভিনব বিকাশ হয়, যার অনেক চিহ্ন সেখানকার বিশাল মন্দির ও স্তূপগুলিতে আজও বর্তমান রয়েছে।

মধ্য এসিয়া ও ভারত : মধ্য এসিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত অরেল স্টাইন মধ্য এসিয়ার মরু-অঞ্চল খুঁড়তে খুঁড়তে ভারতীয় নগরের ধ্বংসচিহ্ন আবিষ্কার করেন। তিনি এখানে অনেক বৌদ্ধবিহার ও মূর্তি, ছবি, পুঁথিপত্র এবং ভারতীয় ভাষাক্ষরে লেখা মূল্যবান বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার করেছেন। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ এ অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার যে সব চিহ্ন চোখে দেখেছিলেন, এখন তা সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হল। মধ্য এসিয়ার

ভারতীয় সভ্যতার
বিস্তার
স্কেল মাইল ০ ৪০০ ৮০০
জাপান
চী ন
ফিলিপাইন
দ্বীপপুঞ্জ
(পণ্যুপায়ন)
বোর্নিও
বরুন দ্বীপ
বরবুদুর
মদুর (মধুর)
যবদ্বীপ
বালি (বলি দ্বীপ)
যা ভা
সিংহল
নিকোবর
(নক্কতরম)
আন্দামান
অজন্তা
উজ্জয়িনী
তমলুক
(তাম্রলিপ্ত)
অযোধ্যা
আরব সাগর
কাবুল
জালালাবাদ
সুচাউ
খোটান
তাসখন্দ
সমরখন্দ
আ র ব
কান্দাহার
শ্যাম
(দ্বারাবতী)
কাম্বোডিয়া
গয়া
লাসা
পামীর
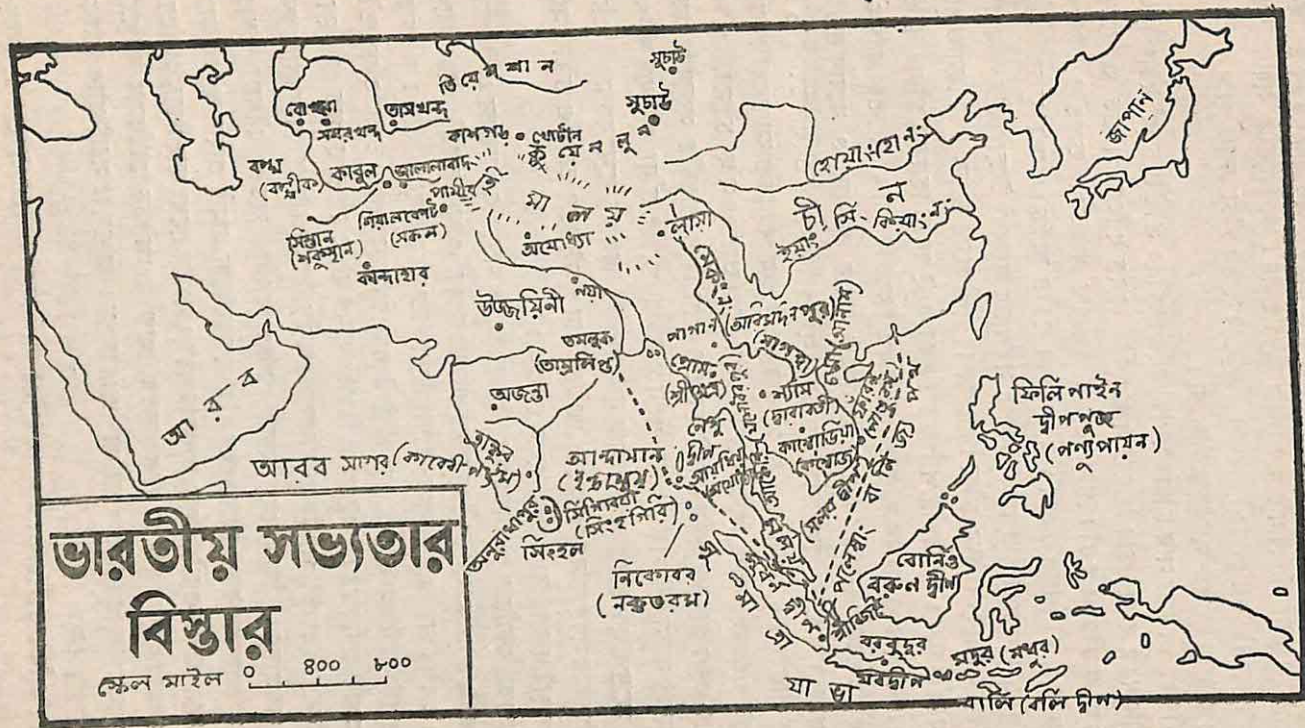
দক্ষিণে খোটান আর উত্তরে কুচি, এই দুটি জায়গা ভারতীয় সভ্যতার বড় কেন্দ্র ছিল। দু'জনেই খোটানে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রভাব দেখেছিলেন। ফা-হিয়েনের সময়ে এখানে সবচেয়ে বড় মঠ ছিল গোমতী বিহার। হিউয়েন সাঙও চীনে ফেরার পথে খোটানের ভারতীয় রাজা বিজিত-সিংহের অতিথি হন।

চীন ঃ ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে উভয় দেশের মধ্যে সভ্যতার বিনিময় সুরু হয়। অনেক ধার্মিক পণ্ডিত ও রাজদূত ভারত থেকে চীনে এবং চীন থেকে ভারতে যাতায়াত করতেন। ভারতীয় বণিকরাও চীন ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে যেতেন। এ সব এখন অতীত স্মৃতি। যখন কুচির পন্ডিত কুমারজীব, কাশ্মীরের রাজপুত্র গুণবর্মণ, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী উজ্জয়িনীর পরমার্থ ও কাঞ্চীর রাজকুমার বোধিধর্ম চীনে গিয়ে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন, তখন ছিল ভারতের এক স্মরণীয় যুগ। ভারতীয় পাণ্ডিত্যের তখন এতই খ্যাতি ছিল যে, চীনের সম্রাটরা এই সব অধ্যাপক ও প্রচারকদের সসম্মানে নিমন্ত্রণ করতেন বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করবার জন্য। বাংলাদেশ থেকে জ্ঞানভদ্র ও যশোগুপ্ত চীনে গিয়েছিলেন। শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, ভারতের সঙ্গীত চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্র চীনে সমাদর লাভ করে। চিত্রশিল্প, বুদ্ধ মূর্তিগঠন ও গুহামন্দির তৈরি করার কৌশল চীন ও ভারত পরস্পরের কাছে শিক্ষা করে। 'তাং' যুগে ভারতের সঙ্গে চীনের মৈত্রী ও সভ্যতার বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। হিউয়েন সাঙ দেশে ফিরে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং সবসুদ্ধ ৪৭ খানি ভারতীয় পুঁথির চীনা অনুবাদ করেন। ই সিং সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে নেমে নালন্দায় দশ বছর পড়াশুনা করেন। তিনিও চীনে ফিরবার সময় অনেক সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে যান। এই ভাবে ভারত ও চীনের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে ভাবের আদান-প্রদান চলছিল।

তিব্বত, কোরিয়া ও জাপান ঃ তিব্বত-ভারত সম্পর্কও পুরাতন। ভারতের এক রাজকুমার নাকি সেখানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, একথা তিব্বতী বইয়ে লেখা আছে। হর্ষবর্ধনের সময় স্রং-সান-গাম্পো ছিলেন তিব্বতের রাজা। তাঁর রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয় এবং তাঁরই উৎসাহে সেখানে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় অক্ষর মালার প্রচার হয়। এই সময়ে তিব্বতে অনেক মঠ ও মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিব্বতী পণ্ডিতরা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ভারতে আসতেন। বিক্রমশিলা বিহার থেকেও বাংলার অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করতে গিয়েছিলেন। তিব্বতে ধর্মগুরু লামার প্রাধান্য। এই ভাবে মধ্য এসিয়া, তিব্বত ও চীন থেকে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা ক্রমশঃ মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারত থেকে মহাপণ্ডিত বোধিসেন জাপানে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের ধর্ম প্রচার করেন। জাপানের সম্রাট তাঁকে অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন।

সুবর্ণভূমি ঃ ভারতের সঙ্গে সুবর্ণভূমির যোগাযোগ ঘটেছিল দু হাজার বছরেরও

আগে। মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা জাভা বালি বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং কম্বোডিয়াআনাম প্রভৃতি দেশগুলির একত্রে নাম দেওয়া হয়েছিল 'সুবর্ণ ভূমি'। বাণিজ্য অথবা বসতির জন্য এই সব দেশে ভারতবাসীরা যেতেন। ক্রমে তাঁদের চেষ্টায় রাজ্য গড়ে উঠল। বিদেহ দ্বারাবতী চম্পা কম্বুজ অমরাবতী প্রভৃতি রাজ্যগুলির নাম দেখলে হিন্দু প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। হরিবর্মণ সূর্যবর্মণ প্রভৃতি রাজাদের নামও ভারতীয়। পণ্ডিতদের মতে ইন্দোচীনের সব চেয়ে বড় নদীর নাম মেকং 'মা গঙ্গা' থেকেই হয়েছে। এইসব অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা অনুন্নত ছিল ; কাজেই ভারতের সভ্যতা সহজেই তারা গ্রহণ করল। অনেক রাজা সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি খোদাই করলেন, কেউ বা শিবের মন্দির স্থাপন করলেন। এই ভাবে সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার নতুন বিকাশ দেখা দিল।

যশোধরপুর ঃ ইন্দোচীনের মধ্যে কম্বোজ (বর্তমান কাম্পুচিয়া) নামে এক রাজ্য ছিল। চীনা ইতিহাসে এই রাজ্যের অনেক পুরানো কথা লেখা আছে। কম্বোজের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আঙ্কোরের ধ্বংসাবশেষ। রাজা যশোবর্মনের সময় বর্তমান **আঙ্কোর ঠোমে** রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানীর প্রাচীন নাম ছিল **যশোধরপুর**। নগর প্রাকারের চার পাশ দিয়ে একটি প্রশস্ত খাতের চিহ্ন আছে, সেতু দিয়ে খাত পার হওয়া যেত। সেতুর দুধারে রেলিংয়ে সাগর-মন্থনের চিত্র আছে। পাঁচটি তোরণপথ দিয়ে নগরে প্রবেশ করা যেত। নগরের মাঝখানে প্রসিদ্ধ বায়ন মন্দির। এটি সম্ভবতঃ শিবের মন্দির ছিল। পিরামিডের মত তিনটি স্তরে নির্মিত এই মন্দিরের পাথরে হিন্দু পুরাণ-কথার অনেক চিত্র খোদিত আছে। যশোধরপুরের প্রাচীন বর্ণনা চীনা রাজদূতের লেখায় পাওয়া যায়। এককালে এই পুরীর শোভা ছিল অতুলনীয়। বিশাল তোরণ, প্রশস্ত অলিন্দ, চত্বর ও প্রাঙ্গণে সুশোভিত এই রাজধানীতে বহু লোকের বসতি ছিল। চওড়া রাস্তা দিয়ে হাতী ও রথ চলত, হ্রদগুলিতে প্রমোদনৌকা ভাসত, মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজত। এখনও বনের মধ্যে ঐ শূন্যপুরী পড়ে আছে।

আঙ্কোর ভাট আর একটি দ্রষ্টব্য কীর্তি। এটি বিষ্ণুমন্দির, এক প্রকাণ্ড সমতল বেদীর উপর অবস্থিত। এই মন্দির আজও ধ্বংস হয়নি। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব রাজা সূর্যবর্মন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। আঙ্কোর ভাটের বিশাল মন্দির হিন্দু কম্বোজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নিচে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড মন্দিরের গায়ে শিল্পকাজগুলি দেখলে অবাক হতে হয়।

কম্বোজের পূর্বদিকে আর একটি হিন্দু রাজ্য ছিল, তার নাম চম্পা। এখানে পাণ্ডুরঙ্গ ও ভৃগু নামে দুটি প্রাচীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। চম্পাতেও অগণিত হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের চিহ্ন রয়েছে। এ রাজ্যে অনেক সমৃদ্ধ নগর ছিল। পো-নগরের মুখলিঙ্গ ও কৌঠার দেবীর মন্দির সুবিখ্যাত। চম্পার দেবমন্দিরগুলি অধিকাংশ ইটের তৈরী, কিন্তু শিল্পরীতির সঙ্গে পল্লভ ও চালুক্য মন্দিরশিল্পের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য

করা যায়। চম্পায় অনেক কীর্তিমান রাজা ছিলেন, কিন্তু কম্বোজ ও চীনের সঙ্গে চম্পারাজ্যের বহুদিন ধরে যুদ্ধের ফলে চম্পার গৌরব অস্তমিত হয়।

এক সময়ে **মালয়** উপদ্বীপ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনেক বসতি ছিল। এইখানে শৈলেন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব বণিকরা এই অঞ্চলে ব্যবসা করতেন। তাঁরা এই রাজ্যটিকে সব চেয়ে ধনশালী ও শক্তিশালী বলে বর্ণনা করেছেন। শৈলেন্দ্র বংশে অনেক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। এই রাজারা মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। সেকালের বাঙলা মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। খুব সম্ভব শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা বাঙলা দেশ থেকে এই বিষয়ে প্রেরণা পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ সাধু কুমার ঘোষ এখানে এসে শৈলেন্দ্র রাজাদের গুরু হন। কুমারঘোষের আজ্ঞায় শৈলেন্দ্র-রাজ তারাদেবীর সুন্দর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজারা শিল্পকলার চর্চায় খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁদের শিল্পপ্রীতি ও জাঁকজমকের পরিচয় পাই অতি যত্নে তৈরি **বরবুদুরের** সুপ্রসিদ্ধ স্তূপে। জাভার (যবদ্বীপ) এই প্রকাণ্ড মন্দির একটি পাহাড়ের উপর আজও দাঁড়িয়ে আছে। এতে ছাদওয়ালা নয়টি থাম, নিম্নতম স্তরটি লম্বায় প্রায় ১৩১ গজ। সর্বোচ্চ থামের মাঝখানে আছে একটি ঘণ্টাকৃতি বৃহৎ স্তূপ। স্তূপগুলির মধ্যে অগণিত বুদ্ধমূর্তি আছে। অলিন্দগুলিতেও চমৎকার কারুকার্য। মালয় ও ইন্দোনেসিয়ায় এককালে রামায়ণ ও মহাভারতের যে বহুল প্রচলন ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে স্থানীয় নৃত্য অনুষ্ঠানে।

সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশেও হীনযান বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট অশোকের সময় থেকেই এইসব জায়গায় বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তার সুরু হয়। সুবর্ণ-ভূমিতে তিনি প্রচারক পাঠান। মগধ থেকে শ্যামদেশে (বর্তমান থাইল্যাণ্ড) বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার হয়, জনশ্রুতি আছে। সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের মন্দিরগুলিতে হিন্দু রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট, তা ছাড়া ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের অনেক নদী ও রাজ্যের নাম ভারতীয়, যেমন ইরাবতী, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা ও সুখোদয়। এই সব অঞ্চলের শাস্ত্র গ্রন্থ পালি ভাষায় লেখা ও পড়া হয়; তাও ভারতের কাছে পাওয়া।

এতক্ষণ যে সব হিন্দু রাজ্যের কথা বলা হল, তাদের জীবনে ভারতীয় প্রভাব এত বেশি পড়েছিল যে আজও তা মুছে যায়নি। কাজেই বলা চলে, ভারতীয় সভ্যতা এককালে অন্য দেশের মানুষকে উৎসাহ ও শিক্ষা দিতে পেরেছে। মালয় অঞ্চল থেকে কালক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম উঠে গেল, মুসলিম ধর্মের উদয় ও প্রসার হল, কিন্তু এখনও সেখানে ভারতীয় প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়নি। একদিকে ভারত, অপরদিকে চীন। উভয়েরই সভ্যতা প্রাচীন, উভয় দেশেই সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘটেছে। তাই এই বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি ভারত ও চীনের কাছে অনেক ঋণী। মধ্য এসিয়ার একটি অংশকে আগে 'সের-ইণ্ডিয়া' বা চীন-ভারত বলা হত। মালয়, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিতেও কত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তাদের সামাজিক জীবনে, আচারে

ও অনুষ্ঠানে এখনও ভারতের সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্কের কয়েকটি চিহ্ন ধরা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শতাধিক লিপি পাওয়া গেছে। বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম সাময়িক ভাবে প্রসার লাভ করলেও এখানে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম বিশেষ করে শৈব বৈষ্ণব ধর্মমতই প্রাধান্য লাভ করে। চম্পায়, কম্বোজে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, মনু, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা হয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবশ্য চম্পার চেয়ে কম্বোজ ও যবদ্বীপের কৃতিত্বই বেশি।

অনুশীলনী

১। বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয়েছিল কি সূত্রে ?

২। কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হয় ?

৩। চীনের সঙ্গে ভারতের কিরূপ সম্বন্ধ ?

৪। তিব্বতে কি ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয় ?

৫। সুবর্ণভূমি কোন অঞ্চল ?

৬। চম্পায় ও কম্বোজে সভ্যতার কি কি নিদর্শন আছে ?

৭। যশোধরপুর কোথায় ? সেখানকার বড় মন্দিরগুলির নাম কর।

৮। বরবুদুর কি জন্য প্রসিদ্ধ ?

৯। ভারত থেকে চীন ও তিব্বত দেশে যে সব পণ্ডিত গিয়েছিলেন তাঁদের নাম বল।

১০। **এগুলি কি বা কোথায় ?**
স্টাইন, খোটান, ইসিং, কুচি, মেকং, যবদ্বীপ, কুমারজীব, পাণ্ডুরঙ্গ, 'ইণ্ডিয়া মাইনর', 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লী সুলতানী

ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা ঃ মামুদ ও ঘুরী ঃ ভারতে মুসলিম রাজ্যের সূত্রপাত হয় যখন আরবরা ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাস্ত করে ঐ প্রদেশ অধিকার করে। কিন্তু আরবরা ভারতের ভিতরে আর অগ্রসর হতে পারে নি। তার প্রধান কারণ, প্রতীহার রাজারা মুসলিমদের বাধা দিয়ে পশ্চিম ভারতে প্রবল হতে দেন নি। এই ভাবে দু শো বছর কেটে গেলে মধ্য এসিয়ায় তুরান অঞ্চলে তুর্কী মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কয়েকটি রাজ্য পত্তন করে। এরা জাতিতে তুর্ক-আফগান, সাধারণত পাঠান বলে পরিচিত। এই রকম এক ক্ষুদ্র রাজ্য **গজনীর সুলতান** ছিলেন **মামুদ**। ভারতে হিন্দুদের বিপুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ও সেখানকার পৌত্তলিক ধর্ম উচ্ছেদ—এই দুটি সঙ্কল্প নিয়ে তিনি মোট সতেরো বার উত্তর ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। তাঁর শেষ অভিযান সৌরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ মন্দির সোমনাথ লুণ্ঠনের উদ্দেশে। মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ করে মামুদ প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে যান, তাই ইতিহাসে তিনি নিষ্ঠুর ধর্মদ্বেষী লুণ্ঠনকারী হিসাবে কুখ্যাত। কিন্তু স্বদেশে তাঁর অন্য পরিচয়। সেখানে তিনি একটি বড় বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজসভায় প্রসিদ্ধ 'শাহনামা'র লেখক ফির্দৌসি প্রভৃতি পণ্ডিতদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। আর ছিলেন রাজসভার অলঙ্কার, বিখ্যাত মনীষী অল্‌বিরুনি।

এর পর ঘুর বংশের **সুলতান মহম্মদ ঘুরী** সুলতান মামুদের দেখানো পথেই উত্তর ভারতে মুসলিম আধিপত্য অনেকটা কায়েম করেছিলেন। এই সময়ে রাজপুত রাজ্যগুলি, যেমন আজমীরের চৌহান ও কনৌজের গহড়বাল বংশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু দ্বাদশ শতকে ঘুরীর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজারা সমবেত ভাবে বাধা দিতে পারেন নি। ঐক্যবদ্ধ হয়ে বহিঃশত্রুকে প্রতিরোধ না করার কারণ, জাতীয়তাবোধ এবং বিপদ সম্বন্ধে হুঁসিয়ারির অভাব আর নিজেদের মধ্যে কলহ ? যেমন, দিল্লী আজমীরের রাজা বীর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের ঘোর শত্রুতা। তরাইনের বিশাল প্রান্তরে দ্বিতীয়বার তিরৌরীর যুদ্ধে ঘুরী পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করলেন। রাজপুতরা প্রাণপণে লড়াই করলেও হেরে গেলেন। পৃথ্বীরাজের বীরত্বের কাহিনী লোক-সাহিত্যে আজও অমর হয়ে আছে। দিল্লীর পতন হলে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হল। প্রধান বাধা ছিল রাজপুত রাজ্যগুলি। তাই একের পর এক

উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারতে হিন্দু রাজাদের পরাস্ত করে দমনে রাখাই তুর্কী সুলতানদের মুখ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল।

দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঃ প্রকৃতপক্ষে **কুতবুদ্দিন আইবকই** হিন্দুস্থানে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন যা ৩২০ বছর টিকে ছিল। রাজধানী ছিল দিল্লী এবং প্রথম সুলতানরা **'দাস বংশ'** নামে পরিচিত। কারণ, কুতব ও তাঁর দুজন উত্তরাধিকারী প্রথম জীবনে দাস ছিলেন, কিন্তু আসলে এঁরা **অলবারি তুর্কী**। তারপরে উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন ইলতুৎমিস ও গিয়াসউদ্দিন বলবন। ইলতুৎমিসের সময়ে দিল্লীর কুতবমিনার তৈরি হয়। অনেকের মতে মিনারের নীচের তলাটি সম্ভবতঃ

হিন্দু-মন্দির প্রভৃতির ভাঙ্গা মালমশলা নিয়ে তৈরি। কুতবমিনারের মাথাটি ভেঙ্গে পড়ে গেছে, তবু এখনও ২৪২ ফুট উঁচু। আর এক বিখ্যাত সুলতান হলেন **বলবন**। এক দিকে মোঙ্গল আক্রমণ রোধ, অপরদিকে বিদ্রোহ দমন, এই দুটি ব্যবস্থার জন্য তিনি বিখ্যাত। দৃঢ় ও কঠোর শাসক হলেও তিনি গুণীদের খুব সমাদর করতেন। প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু ও ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর সভায় থাকতেন। সুদক্ষ সুলতান হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।
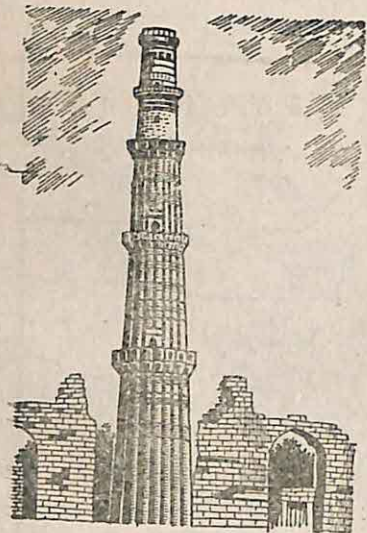
কুতবমিনার

'দাস' বংশের পতন হলে **খলজী বংশ** প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম সুলতান জালালউদ্দিন খলজীর পরে আলাউদ্দিন সিংহাসন অধিকার করে দৃঢ় শাসন ও রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দেন। তিনি দিগ্‌বিজয়ী হতে চেয়েছিলেন, তাই 'সেকেন্দর শাহ' উপাধি নেন। রাজপুত রাজ্যগুলি জয় করে ও উত্তর ভারতে প্রায় সর্বত্র আধিপত্য স্থাপন করে আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতে অগ্রসর হন। ব্যাপক তুর্কী অভিযানের ফলে বহু নগর লুঠ ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে মৌর্য যুগের পর এই দ্বিতীয় বার প্রায় সারা ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। আলাউদ্দিনের রাজত্ব কালে মোঙ্গলরা একাধিকবার আক্রমণ করে। তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তিনি কয়েকটি দুর্গ তৈরী করেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের রুখতে পেরেছিলেন। তিনি সকলের উপর কড়া নজর রাখতেন, নিজেই রাজকার্য চালাতেন। গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন, বহু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন, সন্দেহ হলে লোকদের প্রাণদণ্ড দিতেন এবং প্রজাদের উপর খাজনা চাপালেন।

আলাউদ্দিন

প্রকাণ্ড সৈন্যদলের জোরেই আলাউদ্দিন সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। তাই বণিকরা যাতে দাম না বাড়াতে পারে এবং সৈন্যরা সস্তায় জিনিস পায়, সে জন্য তিনি বাজারে জিনিস-

পত্রের দাম বেঁধে দেন। কেউ কেউ বলেন, এই সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থায় প্রজাদের সুবিধা হয়েছিল, আবার অন্যরা বলেন তা হয়নি, বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। তিনি তুর্ক-আফগান আমলের শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং দিল্লীতে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান। দিল্লীর কাছে নতুন রাজধানী সিরি নগর তাঁরই তৈরি। কুতব মিনারের পাশে আলাই দরওয়াজা এবং অনেক মসজিদ তাঁর শিল্পরুচির পরিচয়। বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু তাঁরও সভাসদ ছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর সাম্রাজ্যে নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

খলজী বংশের পতনের পর এলেন **তুঘলকরা**। এই বংশের দুজন বিখ্যাত সুলতান হলেন **মহম্মদ বিন্ তুঘলক** আর **ফিরুজ তুঘলক**। মহম্মদ তুঘলকের **সময়ে** বিখ্যাত পর্যটক মরক্কোবাসী ইবন বতুতা ভারতে এসেছিলেন। 'সফর-নামা' বইখানিতে তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তিনি সম্রাটের চরিত্রকে 'বিপরীতের মিশ্রণ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলতানের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর খামখেয়াল ও নিষ্ঠুরতার কথাও উল্লেখ করে গেছেন। নানা গুণ সত্ত্বেও বুদ্ধির দোষে ও খেয়ালের বশে তিনি সমস্ত নষ্ট করেন। ইবন বতুতার মন্তব্য অনেকটা সত্য। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন সুলতানের সব পরিকল্পনাই বাতুলতা ছিল না।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক

ফিরুজ শাহ অনেকটা ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হওয়ায় দিল্লী সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গেল। এখন যা বাকি রইল তাতে তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করলেন। দুর্ভিক্ষের সময় কৃষিঋণ তিনি মকুব করলেন এবং অনেক অন্যায় শুল্ক ও কর বন্ধ করে দিলেন। তিনি পতিত জমিতে প্রজা বসিয়ে চাষের উন্নতির জন্য খাল কাটালেন, অনেক মসজিদ, পান্থশালা ও বিদ্যালয় তৈরি করালেন। যমুনার বিশাল খাল তাঁরই কীর্তি। সুতরাং ফিরুজ তুঘলক অনেকগুলি জনহিতকর কাজ করে যান। তাঁর আমলে অনেক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, আফিক ও বরানীর লেখা দুখানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তুঘলক বংশের পতন সুরু হয়। সেই দুর্দিনে হিন্দুস্থান তৈমুর লঙের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। শেষ তুঘলক সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর **এল সৈয়দ ও লোদী** বংশ। শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর আত্মীয় শত্রুরা চক্রান্ত করে কাবুলের রাজা তৈমুর বংশীয় বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত প্রথম পানিপথের যুদ্ধে **বাবর** ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিল্লী দখল করেন। বাবর দিল্লীতে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন, সেটাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ **মুঘল সাম্রাজ্য**।

সুলতানী শাসন পদ্ধতি ঃ সুলতানী আমলে শাসনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যগুলি এখন সংক্ষেপে বলি। সুলতানী শাসনকে স্বৈরতন্ত্র বলা যায়। অর্থাৎ সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা, তবে উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা কোরানের নির্দেশ মেনেই চলতেন অবশ্য আলাউদ্দিন খলজী তাঁদের প্রাধান্য দিতেন না। যাই হোক, দিল্লী সুলতানী ছিল মোটের উপর ইসলামী রাষ্ট্র এবং শাসনপদ্ধতির ভিত্তি ছিল সামরিক। সমগ্র দেশটি ছিল যেন এক বিরাট সেনাবাস। সৈন্য শিবির দুর্গ-প্রাসাদগুলি ছিল রাজশক্তির কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বে-সামরিক রাজকর্মচারীদের দিয়ে শাসন-কাজ চালানোর তেমন বন্দোবস্ত ছিল না।

সুলতানী শাসন ছিল বংশানুক্রমিক। কিন্তু বাঁধা-ধরা উত্তরাধিকার আইন ছিল না বলে সিংহাসনের দাবি নিয়ে প্রায়ই মারামারি ও রক্তপাত হত। আমীর-ওমরাহদের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তাঁরা দলে ভারি হয়ে যাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করতেন, তিনিই গদিতে বসতেন। আলাউদ্দিন খলজী এই চক্রান্তকারী ক্ষমতালোভী ওমরাহদের দাবে রেখেছিলেন। সুলতানী আমলে রাজ্যগুলিতে বেশির ভাগ বড় সেনাপতিরাই শাসনকর্তা হতেন। তাঁরা প্রায় সব বিষয়ে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন। শুধু সম্রাটকে আনুগত্য জানানো ও দরকার হলে সৈন্য-সাহায্য দেওয়া ছিল তাঁদের কর্তব্য, আর দায়িত্ব ছিল সীমান্ত রক্ষা ও রাজ্যে শান্তি বজায় রাখা। আবার রাজ্যপালদের সঙ্গে তাঁদের অধীনস্থ হিন্দু রাজা ও ভূ-স্বামীদের ঐ রকম সম্পর্ক ছিল। এঁরাও নিজ নিজ এলাকা স্বাধীন ভাবে শাসন করতেন। সর্তের মধ্যে উপরওয়ালাকে নিয়মিত কর আর সৈন্য-সাহায্য দান।

এই সবই সামন্ত প্রথার লক্ষণ। সম্রাটের যিনি প্রধান উপদেষ্টা বা মন্ত্রী থাকতেন, তিনি উজীর। সম্রাট উজীরের পরামর্শে দরবারে বসেই আবেদন শুনতেন ও বিচার করতেন। মামলার বিচার করতেন কাজীরা মুসলিম আইন-অনুসারে। তবে হিন্দুদের বেলায় স্থানীয় প্রথা ও আচার অগ্রাহ্য করা হত না। রাজস্ব বিভাগের বেশির ভাগ হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। খাজনা উসুল করা, রাজকোষে রাজস্ব পাঠানো, জমি সংক্রান্ত মামলার মীমাংসা করা, এইগুলি ছিল তাদের দায়িত্ব। সমাজে শ্রেণী-বিভাগ ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ত যুগেরই মতো। শাসক ও প্রজাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল না। হিন্দু প্রজা ও অধীনস্থ হিন্দু রাজাদের 'জিজিয়া' বা তীর্থ-কর দিতে হত। সমাজে ও রাষ্ট্রে সব চেয়ে যারা নীচে, সেই জন-সাধারণ ও কৃষকদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি।

নব আন্দোলন ঃ মুসলমানরা যখন ভারতে আসেন, তখন হিন্দুদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে তাঁদের সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমতে লাগল। পাশাপাশি থাকলে মেলামেশা অনিবার্য হয়। সেই সূত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা সুবিবেচক ব্যক্তি, তাঁদের চেষ্টাতেই দুটি সভ্যতার সংযোগ হল। দুই সমাজের মধ্যেই যে সব গোঁড়ামি ও দুর্নীতি ছিল, তার বিরুদ্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা

আন্দোলন তুললেন। তার ফলে এক উদার নতুন ধর্মভাব দেখা দিল যার কথা হল—সাম্য প্রেম ও ভক্তি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ভাল ভাল উপদেশগুলি একত্র মিশিয়ে মিলনের সেতু রচনা করতে থাকেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে হিন্দুর ভগবান আর মুসলমানের ভগবানের কোনও তফাৎ নেই। সাধু জীবন যাপনের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। আসল জিনিস হল ঈশ্বরে ভক্তি, সকল মানুষকে সমান ভালোবাসা। উচু জাত আর নীচু জাতের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। এই ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য ও নানকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামানন্দ ও কবীরঃ রামানন্দ ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারক। তিনি ছিলেন রামের উপাসক। তিনি ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে কোন তফাত করতেন না। উত্তর ভারতে ঘুরে ঘুরে তিনি ঈশ্বরের একত্ব আর সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রচার করতেন। তাঁর বারো জন প্রধান শিষ্য ছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন নাপিত, একজন মুচি আর একজন জোলা। রামানন্দের অন্যতম বিখ্যাত শিষ্য হলেন **কবীর**। কেউ কেউ বলেন কবীরের জন্ম উচ্চ হিন্দু বংশে, তবে লোকে তাঁকে জোলা ও মুসলমান বলেই জানত। কবীর ক্রমে নাম জপ করে ঈশ্বরের চিন্তা করে নিজেও একজন মহাপুরুষ হলেন। তাঁর রচিত অনেক হিন্দী গান আছে। কবীরের শিষ্যদের 'কবীর-পন্থী' বলা হয়। উত্তর ভারতে এখনও অনেক কবীর-পন্থী আছেন। কবীরের 'দোঁহা' বা কবিতা-

কবীর

গুচ্ছ হিন্দী সাহিত্যের বড় সম্পদ। কবীর তাঁর মত প্রচার করে হিন্দু মুসলমানকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাই বল আর হরিই বল, রাম বল বা খোদা বল—মানুষের মনের ভক্তি প্রার্থনা একজনেরই কাছে পেঁছিবে। মানুষে মানুষে জাতিভেদ নেই। সব ধর্মই এক, সকল ধর্মের মূল কথায় তফাৎ নেই। এই জন্য হিন্দু মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোক কবীরকে খুব শ্রদ্ধা করত এবং এখনও করে।

শ্রীচৈতন্য ঃ বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে চৈতন্যদেবের নাম সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জন্ম নবদ্বীপে, পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। বাল্যকালে তাঁর আগের নাম ছিল নিমাই। তিনি নানা বিদ্যার চর্চা করেছিলেন এবং অনেক পণ্ডিতকে তর্কে-বিচারে হারিয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে তিনি কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করেন ও পরম হরিভক্ত হন। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল, মনে কোনও লোভ অহংকার ছিল না। চৈতন্যদেব লোককে

ঈশ্বর প্রেম শেখালেন। তাঁর মূল নীতি হল, ভক্তি ও নামকীর্তন। সর্বজীবে দয়া, বিনয়, সদাচার ও ঈশ্বরপ্রেমই যে মুক্তির উপায় এই ছিল তাঁর উপদেশ। তাঁর সুমধুর শিক্ষায় লোকে মোহিত হত। অনেক দুষ্ট লোক প্রথমে তাঁর শত্রু হয় ও অনিষ্ট চেষ্টা করে কিন্তু শেষে তাঁর অগাধ কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হয়। তিনি জাতি ধর্ম না মেনে সকলকেই ভালোবেসেছেন। এক মুসলমানকে তিনি হরিনামে দীক্ষা দেন, তিনি 'যবন হরিদাস' বলে খ্যাত। নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁর নিত্য সঙ্গী, অপর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন রূপ ও সনাতন। পশ্চিমে বৃন্দাবন, দক্ষিণে ওড়িশা আর দাক্ষিণাত্যে চব্বিশ বছর ঘুরে চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মপ্রচার করেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। নীলাচলে (পুরী ধামে) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। বাঙলায় ও বাঙলার বাইরেও তিনি এক মহাপুরুষ বলে পূজিত হন। তিনিই প্রথম জনসাধারণের মধ্যে ভক্তি-ভাব ও প্রেম বিতরণ করেন। 'নদীয়ার নিমাই', বাঙলার মহাপ্রভু, চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে বাঙলায় এক মধুর বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছে।

চৈতন্য

নানক ঃ নানকের জন্ম পাঞ্জাবে। নিজ চরিত্রগুণে তিনি সেখানকার হিন্দু মুসলমান সকলেরই ভক্তির পাত্র হয়েছিলেন। ঈশ্বর এক, তিনি যে সর্বত্র আছেন, এই ভাবটি ক্রমশ তাঁর মনে জাগল। মক্কায় গিয়ে তিনি নাকি পবিত্র 'কাবা'র দিকে পা রেখে শুয়েছিলেন। তাতে এক মোল্লা তাঁকে তিরস্কার করলে নানক রাগ না করে তাঁকে বললেন, 'মোল্লা সাহেব আমি দোষী। খোদা যেদিকে নেই, দয়া করে সেইদিকে আমার পা ফিরিয়ে দিন।' মোল্লা তখন তাঁর জবাবের প্রকৃত মানে বুঝে লজ্জিত হয়ে চলে যান। উপাসনার ব্যাপারে নানক জাতিভেদ মানতেন না। অনেক মুসলমানকেও তিনি শিষ্য করেন। তাঁর শিষ্যরা 'শিখ' নামে পরিচিত। নানকের উপদেশগুলি প্রাচীন হিন্দিতে

নানক

লেখা। শিখরা তাঁর জপজী ও গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন। পাঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান সবাই 'বাবা' নানকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

নামদেব একনাথ রবিদাস প্রভৃতি মধ্যযুগের অন্যান্য সাধু সন্ত জাতি-ধর্ম শ্রেণীর প্রভেদ অস্বীকার করে সকল মানুষকে কাছে টেনেছিলেন। ধর্মের মূল ভিত্তি যে ভক্তি ভালোবাসা, সকলের উপরে মানুষ সত্য—এই সার কথাগুলি তাঁরা প্রচার করে গেছেন। এই কারণে এই নতুন শিক্ষাকে **ভক্তি আন্দোলন** বলা হয়। আরও এক সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও প্রচারক ছিলেন, তাঁরা সুফী নামে পরিচিত। সাধু চরিত্র, ভক্তি ও আদর্শের বলে এঁরা হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই সুফীদের শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌ভাব জাগে। এঁদের মধ্যে আজমীরের মইনুদ্দিন চিস্তি, দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়া এবং বাঙলার কুতব আলল ও শাহ জালালের নাম বিখ্যাত।

সাহিত্য, ইতিহাস ও স্থাপত্য শিল্প ; তুর্ক-আফগান আমলে বাংলার হুসেন শাহ ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান রাজারা হিন্দু সংস্কৃতি সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন। বাঙলা, মারাঠী প্রভৃতি স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্য এই হিসাবে সুলতানদের নিকট ঋণী। ইলতুৎমিস বলবন ও মহম্মদ তুঘলক সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁদের সময় অনেক পারসী কবি ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ যুগের কবিদের মধ্যে আমীর খসরু ও
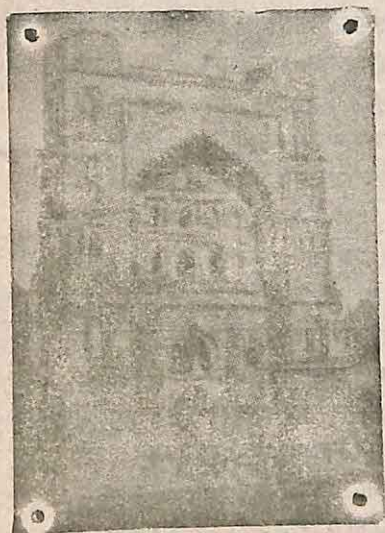
অটলা দেবী মসজিদ

জমী মসজিদ

হাসান এবং ইতিহাস লেখকদের মধ্যে **মিনহাজউদ্দিন ও জিয়াউদ্দিন বরানির** নাম বিখ্যাত। এঁদের রচনা থেকে সুলতানী যুগে ভারতের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

সুলতানরা স্থাপত্য-শিল্প খুব পছন্দ করতেন। তাঁদের উৎসাহে ভারতের অনেক

স্থানে বহু সুন্দর মস্‌জিদ, সমাধি ও প্রাসাদ তৈরী হয়। সেগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার ছাপ দেখা যায়। দিল্লীর কুতবমিনার নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা, তুঘলকের কবর প্রভৃতি ইমারতে ইসলামী প্রভাব বেশী। কিন্তু বাংলার আদিনা ও একডালা মস্‌জিদ দেখলেই বোঝা যায়, উভয় সভ্যতার মিশ্রণে এক নতুন ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল। আজমীরের আড়াই-দিন-কি ঝোপড়া, আহমদাবাদের জমী মস্‌জিদ, জৌনপুরের অটলা দেবী মস্‌জিদ প্রভৃতি ইমারতগুলি এই হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য-কৌশলের পরিচয় দেয়।

দেশের অবস্থা ঃ তুর্ক-আফগান আমলে সব দিকেই কিছু-না-কিছু ভাল কাজ হয়েছিল। বিশেষ করে স্থাপত্য-শিল্পের উন্নতি, সমাজধর্মে মিলনের চেষ্টা, লেখাপড়ার চর্চা, ইতিহাস-রচনা, হিন্দী ও পারসীক ভাষার মিশ্রণে উর্দুভাষার উৎপত্তি আর বাঙালী মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি, নিশ্চয়ই গৌরবের কারণ। কিন্তু দেশে স্থায়ী শান্তি ছিল না, প্রদেশ অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রায়ই লেগে থাকত। সামরিক শক্তির জোর দেশশাসন শৃঙ্খলা রাখতে পারেনি।

এই সময় দেশের অবস্থা কি ছিল, তা কিছু কিছু জানা যায় পর্যটকদের বিবরণ থেকে আর এদেশের লেখক ও ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে। এ যুগে **নিকিতিন, নিকোলো কণ্টি, বার্বোসা, বতুতা** প্রভৃতি অনেক বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন ও তাঁদের মন্তব্য লিখে যান। অধিকাংশ লেখকই দেশের বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার সুখ্যাতি করে বলেছেন, বিদেশী বণিক সোনা হাতে করে আসে, আর ভারতে সে সোনা রেখে যায়। তাঁরা যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় রাজধানীর ঐশ্বর্য, সম্ভ্রান্ত লোকদের জাঁকজমক, রাজদরবারে আড়ম্বর ছিল বটে, কিন্তু দেশের সাধারণ অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কৃষক-প্রজাদের দুর্দশা তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

ভারতের অধিকাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে থাকত, বিলাস-ঐশ্বর্যে ভরা রাজধানী থেকে বহু দূরে। তাই রাজায়-প্রজায় সম্পর্ক খুব কম ছিল। সামন্ত প্রথার যুগে পৃথিবীর সর্বত্র যা দেখা যায়, ভারতেও তাই ছিল। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরে রাজা তাঁর অনুগত সভাসদ ও সামন্তদের নিয়ে বিলাসিতায় অর্থব্যয় করতেন, প্রাসাদ মসজিদ গড়তেন। আর সকলের নীচে রাজা ও আমীর ওমরাহ্‌দলের ক্রীতদাসরা নির্যাতন ভোগ করত। তাদেরই পরিশ্রমে ইমারত উঠত, খাল কাটা হত। বড় মানুষদের হাতে জমি, বাণিজ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি আর সাধারণ কৃষক প্রজারা খাজনার চাপে উৎপীড়িত, এই ছিল দেশের সাধারণ অবস্থা। এই যুগের প্রকৃত ইতিহাস ঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু আমীর খসরু যখন সমবেদনার সুরে লিখেছিলেন, 'রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা দরিদ্র সাধারণের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়া জমাট রক্তবিন্দু', তখন তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন।

বাংলায় মুসলিম শাসন ঃ মহম্মদ বখ্‌তিয়ার বাংলা দেশ আক্রমণ করলে, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকাংশ পাঠানদের হাতে চলে যায়। কালে প্রায় সমস্ত বাংলা-মুসলমানদের হাতে আসে। কিন্তু যখন দিল্লীর সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে থাকে, তখন বঙ্গের তুর্কী

শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন হয়ে রাজত্ব করতে থাকেন। এর কিছুদিন পরে **ইলিয়াস**-নামে এক ব্যক্তি সমস্ত বাংলা ও বিহারের খানিক অংশ রাজ্যভুক্ত করে পাণ্ডুয়া নগরে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন ও সামসুদ্দিন উপাধি ধারণ করেন। সুলতান সামসুদ্দিনের মৃত্যু হলে পুত্র **সিকন্দর শাহ** বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। মাঝখানে বেশ কিছু কাল বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে। তখন দেশের সর্দার ও প্রধান ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে হুসেন শাহ নামে এক রাজ-কর্মচারীকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হুসেন শাহ ঃ হুসেন দেশে শান্তি স্থাপন করেন, বাংলার এই বিখ্যাত উদার সুলতান প্রায় ২৫ বছর রাজত্ব করেন। হুসেন শাহের পরে তাঁর পুত্র **নসরৎ শাহ্** সিংহাসনে বসেন। তিনিও যোগ্য নরপতি ছিলেন। তাঁর পর সুলেমান কররানী নামে এক পাঠান বাংলায় রাজত্ব করেন। হুসেন শাহের একশত বছর পরে মোগল সম্রাট আকবর অনেক যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

সমাজ ও সাহিত্য ঃ মুসলমানরা বাংলা দেশ জয় করার ফলে বাঙালী সমাজ ও জীবন একটি নতুন রূপ নিল। হিন্দুরা প্রজা, মুসলমানরা শাসক কিন্তু অনেক মুসলমান এই সময়ে হিন্দুদের কয়েকটি আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। তাদের চাল-চলন খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। এদিকে হিন্দুরাও বেশভূষায় মুসলমান প্রভাব স্বীকার করল, আরবী ও পারসী ভাষা শিখে কর্মচারী হল। মুসলমানদের পীর ফকির হিন্দুর কাছে সম্মান পেলেন। আবার হিন্দু সাধুরা মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হলেন। হিন্দুরা পীরের দরগায় মানত করত। এই ভাবে সত্যপীরের পূজা পীর-উপাসনা থেকেই এসেছে।

এ যুগে বাঙলা সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়, বাঙালীর সাহিত্য রচনায় হুসেন বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়েছিলেন। 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যের কবি **বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস** নিজ নিজ রচনায় হুসেন শাহকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। এই যুগে বর্ধমানের কবি **মালাধর বসু** 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনা করেন। হুসেন শাহ তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দেন। চট্টগ্রামের এক কবি **'শ্রীকর নন্দী'** মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ করেন। হুসেন শাহের আমলে বাঙলা ভাষায় প্রথম মহাভারত রচিত হয় এবং পদ্মপুরাণ গ্রন্থেরও পদ্যানুবাদ হয়। তাঁর সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি ছিল। **গোপীনাথ বসু ও পুরন্দর খাঁ** প্রভৃতি কায়স্থ আর দুই ব্রাহ্মণ ও পরম বৈষ্ণব **রূপ ও সনাতন** হুসেন শাহের প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। এই যুগে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ও সমাদর ছিল। নবদ্বীপ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থানে অনেক টোল চতুষ্পাঠী ছিল। ন্যায়শাস্ত্রের চর্চায় বাংলাদেশ সে যুগে শ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত ছিল। স্থাপত্য শিল্পেও বাংলার কৃতিত্ব কম ছিল না। পাণ্ডুয়ার **আদিনা মসজিদ,** গৌড়ের **সোনা মসজিদ,** প্রভৃতি বিখ্যাত ইমারতগুলি এ যুগের বাঙালি শিল্পকাজের উৎকৃষ্ট নমুনা।

বাংলার অবস্থা ঃ মধ্যযুগে বাংলার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল। ইবন্ বতুতা বলেছেন যে, বাংলার মত অন্য কোথাও এত সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রী হতে তিনি দেখেন নি। তাঁর বইয়ে লেখা আছে, তখনকার দিনে পাঁচজন লোক নিয়ে একটি সংসার মাসিক এক টাকায় স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাত। এক মণ চালের দাম ছিল দু' আনা। বিদেশে ঢাকার মসলিনের খুব কদর ছিল। বড়লোকের সোনার থালাবাসন ছিল, রুপার তো কথাই নেই। আর এক বিদেশী পর্যটক বাথেমা লিখেছেন, এ সময়ে বাংলাদেশ ছিল পণ্যদ্রব্যের প্রধান আড়ত। আদা চিনি শস্য আর সুতীর কাপড়ের ব্যবসায়ে ছিল বাংলার বাণিজ্য-লক্ষ্মী। কিন্তু দেশের এতটা সমৃদ্ধি থাকলেও সাধারণ লোক সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কতটুকু ভোগ করত তাতে সন্দেহ আছে। জিনিসপত্র সস্তা হলেও বাংলায় টাকার খুব অভাব ছিল। সাধারণ দরিদ্র লোক প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও জিনিস কিনতে পারত না। আর দুর্ভিক্ষ হলে দাম চড়ে যেত সুতরাং তাদের অবস্থা কিছু বদল হয় নি।

॥ অনুশীলনী ॥

অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ১। তুর্কীরা কোথাকার লোক ?

২। গজনীর রাজবংশ স্থাপন করেন কে ? তিনি কতবার ভারত আক্রমণ করেন ?

৩। সোমনাথ কোথায় ? সেখানে কি হয়েছিল ?

৪। মহম্মদ ঘুরী কে ? তিরোরীর যুদ্ধে তিনি কাকে পরাস্ত করেন ?

৫। 'দাস'-বংশ নাম হল কেন ?

৬। ভারতে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র কে স্থাপন করেন ?

৭। প্রথম তুর্কী সম্রাট কাকে বলা যায় ?

৮। 'বিপরীতের মিশ্রণ', এ কথা কেন বলা হয়, কার সম্বন্ধে বলা হয় ?

৯। ফিরুজ তুঘলক কি কি ভালো কাজ করেছিলেন ?

১০। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান কে ? তার সময়ে কে ভারত আক্রমণ করেন ?

১১। প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ কখন ও কাদের মধ্যে হয় ?

(খ) ১। তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ কি ছিল? সেটি কি ধরনের রাষ্ট্র?

২। সুলতানী আমলে সমাজে কোন কোন শ্রেণীর পরিচয় পাও?

৩। এই যুগে রাজস্ব ও বিচারবিভাগ কি ভাবে চালিত হত?

৪। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব কারা সৃষ্টি করেন? সেই উদার ধর্মভাবের মূল কথা কি?

৫। কবীরের বাণী কি? সকলেই তাকে শ্রদ্ধা কেন করত?

৬। চৈতন্যদেব কি শিক্ষা দেন? তার মূল নীতি কি? তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ও শিষ্যের নাম কর।

৭। নানকের জন্মস্থান কোথায়? তিনি কি জাতিভেদ মানতেন? তাঁর শিষ্যরা কি নামে পরিচিত?

৮। মধ্য যুগে ভারতের কয়েকজন সাধু সন্তের নাম বল।

৯। ভক্তিবাদ বা ভক্তি আন্দোলনের কি বৈশিষ্ট্য।

১০। 'সুফী'রা কি প্রচার করেন? দুজন বিখ্যাত সুফীর নাম কর।

(গ) ১। সুলতানী আমলে কোন কোন ভাষার চর্চা ও উন্নতি হয়?

২। এই যুগের একজন কবি ও একজন ইতিহাস লেখকের উল্লেখ কর।

৩। সুলতানী আমলে স্থাপত্য-শিল্পের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও। তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিমের মিশ্র নির্মাণ-রীতির নমুনা কোথায় দেখা যায়।

৪। তুর্ক আফগান সাম্রাজ্যে দেশের ভিতরকার অবস্থা কেমন ছিল? কোথা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়?

৫। এই সময়ে সাধারণ মানুষ কি ভাবে জীবন যাপন করত?

৬। বড় মানুষ আর গরিবদের মধ্যে কি রকম তফাত ছিল? 'আমীর খসরু' এই প্রসঙ্গে কি বলেছেন?

(ঘ) ১। বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে? তিনি কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন?

২। হুসেন শাহের এত প্রসিদ্ধি কেন? তাঁর পুত্র কে?

৩। হুসেন শাহী আমলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কি রকম সম্প্রীতি ছিল? তার কিছু প্রমাণ দেখাও।

৪। এই যুগে বাংলা সাহিত্যের কি উন্নতি হয়?

৫। 'মনসামঙ্গল' কাব্য কার লেখা ?

৬। মালাধর বসু কোন কাব্য রচনা করেন ? তিনি কি উপাধি পান ?

৭। এই যুগে কয়েকজন হিন্দু রাজকর্মচারীর নাম বল।

৮। বাংলায় 'মুসলিম শাসনকালে' সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের কি চর্চা হয়েছিল ?

৯। বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ কর।

১০। এই আমলে বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল ? ইবন বতুতা এ সম্বন্ধে কি লিখে গেছেন ?

১১। বাংলাদেশে সেই সময়ে কোন কোন পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা ছিল ?

———

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসান

পরিচিত জগতের সীমা (আঃ ১৪৫০)

আবিষ্কৃত পৃথিবীর সীমা বিস্তার (আঃ ১৫৫০)

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসান (চোদ্দ ও পনেরো শতক)

মধ্য যুগের পরিচিত জগতের নানা অঞ্চলে মানুষ সভ্যতার পথে কতদূর কি ভাবে এগিয়েছিল, তার পরিচয় তোমরা পেলে। মধ্য যুগের শেষ পর্বে এসে এখন আধুনিক বা বর্তমান যুগের লক্ষণগুলির কথা বলছি।

আধুনিক যুগের লক্ষণ ঃ খৃষ্টীয় চোদ্দ পনেরো শতক থেকেই সমাজের চেহারার পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। তারপর পনেরো-ষোল শতকে য়ুরোপে 'রেনেশাঁস' বা নব জীবনের সূত্রপাত থেকে আধুনিক কালের সূচনা হয়, পণ্ডিতরা এই কথা বলেন। কারণ এই সময়ে য়ুরোপে একটি নতুন ধরনের উদ্দীপনা জাগল যার প্রভাব দেখা গেল মানুষের নানাবিধ চিন্তায় ও কাজে। এতদিন ধরে যা চলে এসেছে, প্রাচীন বইতে যা লেখা আছে, তাকে প্রামাণ্য বা শেষ কথা বলে না মেনে এখন থেকে মানুষের মনে কারণ সন্ধানের প্রবৃত্তি জাগল, কৌতূহল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কেমন করে এটা হয় ?' তার চেয়ে 'কেন এটা হয় ?' সেই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠল। সংক্ষেপে বলা যায়, যে সময় থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ বণিক-ব্যবসায়ী, আইনজীবী, শিক্ষক প্রভৃতি সাধারণ মানুষ নিয়ে সমাজ গড়ে উঠল এবং সেই অনুযায়ী নতুন রাজনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল, সেই সময় থেকে বর্তমান কালের আরম্ভ বলে ধরা হয়। তবে মধ্য যুগে বারো-তেরো শতকের 'রেনেশাঁস-এর সূচনা দেখা গিয়েছিল। নতুন চিন্তা জিজ্ঞাসা, ধর্মসংস্কারের আন্দোলন, সাহিত্যে শিল্পকলায়, বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পে, নতুন রচনারীতির প্রয়োগ পরিস্ফুট হচ্ছিল।

এখন কোন সময়ে বর্তমান যুগের আরম্ভ তা নির্ণয় করা যায় না। কেন যায় না, সে কথা প্রথম অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বলা হয়েছে। ইংলণ্ডের বেলায় ১৪৮৫ সাল ধরা হয়, যেহেতু ঐ সময়ে টিউডর বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে একটি পর্ব সুরু হয়। তেমনি স্পেনের ক্ষেত্রে ১৪৯২, ফ্রান্সের বেলায় ১৪৯১ সাল গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই মোটামুটি ভাবে ১৪৫৩ সাল আধুনিক যুগের সূচনা-কাল বলে এ যাবৎ স্বীকৃত হয়েছে। কারণ ঐ বছরে কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতন ও খৃষ্টান সাম্রাজ্যের বিলোপ

ঘটে। 'অটোম্যান' অর্থাৎ ওসমানী তুর্কীরা সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে পূর্ব য়ুরোপে অগ্রসর হতে থাকে এবং একাধিকবার আক্রমণ চালিয়ে অবশেষে খৃষ্টান রাজধানী কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল দখল করে। তাই ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সম্রাট জ্যাস্টীনিয়নের তৈরী সেই জগৎবিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়া গির্জার গম্বুজে ইসলামের পতাকা উড়ল, তখন তার ফলাফল বিচার করে পণ্ডিতরা মনে করলেন, এই খানে মধ্য যুগের অবসান ও বর্তমান যুগের সূত্রপাত হল। প্রায় হাজার বছর আগে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বর্বর' জাতির আক্রমণে রোমের পতন হয়েছিল, এখন ১৪৫৩ সালে মুসলিম আক্রমণে রোম-সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলেরও পতন হল এই দুটি ঘটনা যুগান্তকারী।

ফলাফলের দিক থেকে কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলেরও পতন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ য়ুরোপে 'রেনেশাঁস' বা পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। এই অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রীক পণ্ডিতরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের অমূল্য গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি নিয়ে দলে দলে পশ্চিম য়ুরোপে চলে আসতে লাগলেন। তাতে প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞান-সম্পদের সঙ্গে পশ্চিম য়ুরোপের পরিচয় প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এতদিন ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম-শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই চলন ছিল। কিন্তু এখন থেকে গ্রীক ভাষার চর্চা সুরু হওয়াতে কাব্য শিল্পকলা ইতিহাস ও দর্শনে সেই প্রাচীন সভ্যতার মহৎ সৃষ্টিগুলির কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা প্রথম জানতে পারলেন। এই আবিষ্কারে সারা য়ুরোপ এক নতুন সাড়া জাগল। দ্বিতীয়তঃ কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলের মধ্য দিয়ে, ইটালির জেনোয়া ভিনিস নগরীর ধনী বণিকরা প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে যে ব্যবসা চালাত, এখন বাণিজ্যের সেই স্থলপথ মুসলমান অধিকারে আসায় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মিশর দেশটি যখন তুর্কীরা দখল করে নিল, তখন আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দর এবং সেখান থেকে লোহিত সাগর দিয়ে পূর্ব দেশে আসার জলপথও রুদ্ধ হল।

এই সব কারণে পোর্তুগাল ও স্পেনের সাহসী নাবিকরা আফ্রিকা ঘুরে ভারত ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে একটানা জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় নামল। সে কাজে তারা সফল হয়েছিল। বাণিজ্যের জন্য যাঁরা নতুন জলপথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন পোর্তুগালের এক অভিজাত বংশের **হেনরি**। তাঁর অনেক পরে এলেন **ভাস্কো-ডা-গামা** যিনি আফ্রিকার উপকূল ঘুরে দক্ষিণ ভারতে মালাবার অঞ্চলে কালিকট নগরে উপস্থিত হন। কেব্রাল ও ম্যাগেলান অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যথাক্রমে ব্রাজিল ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্তরীপে

পেঁছান। **কলম্বাসে**র নাম তো বিশ্ববিখ্যাত। স্পেনের সাহায্যে কয়েকবার সমুদ্রযাত্রা করে তিনি মধ্য আমেরিকার পূর্ব উপকূলের দ্বীপগুলিতে পেঁছান। ভেবেছিলেন এসিয়ায় এসে গেছেন কিন্তু আসলে তিনি যে পশ্চিমের নতুন মহাদেশের কোলে পদার্পণ করলেন তা না জেনেই মারা যান। কলম্বসের পর আমেরিগো ভেসপুচি (যাঁর নাম থেকে আমেরিকা), ব্যালবোয়া, কর্তেজ এবং আরও কয়েকজন অভিযান চালিয়ে মধ্য আমেরিকার অনেক অঞ্চল ও 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হন। এইভাবে পোর্তুগাল ও স্পেন ভৌগোলিক আবিষ্কার করে নতুন জগতের সন্ধান দেয়। তার ফলে পরিচিত জগতের সীমা আরও বেড়ে গেল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যেমন বিস্তৃত হল, সেই দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষাও বাড়তে লাগল। নতুন অঞ্চলগুলিতে পোর্তুগাল স্পেন এবং তার পরে হল্যাণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করল। সেখানকার কাঁচা মাল, নানা রকম রসদ নিজেদের কাজে লাগিয়ে বড় রকম সওদাগরী ব্যবসা সুরু করে দিল। তার মধ্যে সব চেয়ে ঘৃণ্য ছিল স্পেন ও পোর্তুগালের ক্রীতদাস ব্যবসা। তারা আফ্রিকা থেকে সমানে নিগ্রো চালান দিয়ে অমানুষিক অত্যাচারে তাদের খাটিয়ে নিত এবং সস্তায় কিংবা বিনা মজুরিতে যে সব জিনিস উৎপন্ন হত, তা থেকে তারা বিস্তর লাভ করত। এইভাবে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শ্বেতকায় জাতীয় উপনিবেশ-সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তারই ফলে সওদাগরী প্রথা (বাণিজ্যতন্ত্র) চালু হল। পোর্তুগাল স্পেন যখন হীনবল হয়ে গেল, তখন ওলন্দাজ (হল্যাণ্ড), ব্রিটিশ ও ফরাসীরা নামল উপনিবেশ বিস্তার করে সেখানে সাম্রাজ্য গঠনের কাজে। তার ফলে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং ক্ষমতার লড়াই চলেছিল প্রায় দুশো বছর ধরে।

বর্তমান যুগের সূচনায় যে ভৌগোলিক আবিষ্কারের পালা সুরু হয়, তার একটি বড় ফল হচ্ছে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও বিজ্ঞান-চর্চা। সমুদ্রপথে অভিযান করতে হলে চাই সাজ সরঞ্জাম। যেখানে চারদিকে মহাসাগরের অথৈ জল, নানা রকম স্রোতের টান, ঝড়ে দুর্যোগে জাহাজ ডুবির আশঙ্কা সেখানে বাঁচিয়ে চলার প্রয়োজনে নানা উপায় উদভাবিত হতে লাগল। আবিষ্কৃত হল দিক-নির্ণয়ের জন্য নাবিকদের **কম্পাস, অ্যাস্ট্রোলেব, সেক্সট্যাণ্ট** প্রভৃতি নতুন যন্ত্র যার সাহায্যে সমুদ্রযাত্রা সহজসাধ্য হয়। এইভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানের চর্চা ও তার ব্যবহার যুক্ত হল। বিজ্ঞান চর্চার মূল ভিত্তি হল, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চোখে দেখা জিনিস বা তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা, তারপর আদায়কারী তথ্যগুলি বাদ দিয়ে কার্য-কারণ সূত্র সন্ধান করে একটি সিদ্ধান্ত

খাড়া করা। পনেরো শতক থেকে বিজ্ঞানের এই রকম অনুশীলন ও প্রয়োগ হতে থাকে এবং পরবর্তী কালে তার বিস্ময়কর প্রসার দেখা যায়।

পোপের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য ক্রমেই কমে আসার ফলে খ্রীস্টান জগতের মধ্যে যে ঐক্য-ভাবটি ছিল, তা ক্ষীণ হয়ে এল। তাই দেখতে পাই, পনোরো শতকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিম য়ুরোপে অনেক অঞ্চলে জাতীয় ভাব জাগ্রত হয়। ফলে খ্রীস্টান জগতে ভাঙ্গন সুরু হলে এক এক জায়গায় জাতীয় রাষ্ট্র (নেশ্যন স্টেট) গড়ে উঠে। যেমন বলা যায়, শেষ মুসলিম রাজ্যের পতনের পর স্পেন দেশে খ্রীস্টান রাজ্যগুলি একতাবন্ধ হয়ে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রান্সেও সামন্ত রাজ্যগুলি লুপ্ত হয় এবং একটি বড় রাজ্যের পত্তন হয়। ইংলণ্ডে অবশ্য একটা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল, পোপের কর্তৃত্ব সেখানে চলত না। কিন্তু টিউডর বংশ (যে বংশের বিখ্যাত রানী ছিলেন প্রথম এলিজাবেথ) প্রতিষ্ঠিত হলে, দেশের মধ্য অরাজকতার অবসান হয় এবং একটি সংহত শক্তিমান রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সব রাজ্যে যে দৃঢ় রাজশক্তির বনিয়াদ তৈরী হয়, তাকে বলা হয় '**নুব্য মনার্কি**' অর্থাৎ নতুন রাজতন্ত্র। তার ফলে রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব চালু হয় এবং ক্রমে আরও শক্তিশালী হতে থাকে। মধ্য যুগের এই শেষ পর্বকে (আঃ ১৩৫০-১৫০০) "য়ুরোপের রূপান্তর" বলে বর্ণনা করা হয়।

মোটের উপর বলা যায়, রেনেশাঁসের যুগ থেকেই বর্তমান যুগ আরম্ভ হয়েছে। ভৌগোলিক আবিষ্কার নতুন দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন, সওদাগরি করে প্রচুর লাভ এই সব থেকে বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যাদের হাতে অনেক পয়সা জমতে থাকে। লেখাপড়ার চর্চার ফলে এক শ্রেণীর মানুষ, যাদের 'বুর্জোয়া' বা মধ্যবিত্ত বলা যায়, ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে। এর ওপর যখন জার্মানিতে মার্টিন লুথার পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 'প্রোটেস্ট্যান্ট' ধর্মমত প্রবর্তন করলেন, তখন রেনেশাঁস আর রিফর্মেশান (ধর্মসংস্কার) দুয়ে মিলে মানুষের মনে এক দিকে জ্ঞানচর্চা ও যুক্তিবাদ, অপর দিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবি সৃষ্টি করল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য ক্রমেই ব্যগ্র হয়ে উঠল এবং একজোট হয়ে কখনও বা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, প্রজাসাধারণের দাবি আদায় করে নিল।

রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম দাঁড়িয়েছিল ইংলণ্ডের ব্যারণ ও নাইটরা। তারা ১২১৫ সালে রাজা জন-কে দিয়ে 'ম্যাগনা কার্টা' বা মহাসনদ সই করিয়ে নেয়। এর পঞ্চাশ বছর পরে সাইমন ডি মণ্টফোর্ট নামে এক বিদেশী ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট প্রথা প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেন। তারপর ১২৯৫ সালে রাজা প্রথম এডওয়ার্ড 'মডেল' বা

আদর্শ লোকসভা আহ্বান করেন। তাতে ব্যারন ও নাইট সম্প্রদায় ছাড়া 'বরো' বা নগরগুলি থেকে প্রতিনিধিরা এসে যোগ দেয়। এই ভাবে তেরো শতক থেকে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট প্রথার গোড়াপত্তন হয়। ক্রমে 'বুর্জোয়া' শ্রেণী তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ষোল-সতেরো শতকে তাদের দাবি জানাতে থাকে। রাজার স্বৈরাচার তারা মানতে চায় নি, ফলে দু দু'বার তারা প্রবল প্রতিরোধ করেছিল। প্রথমবার গৃহযুদ্ধ বাধে ও রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়, আর দ্বিতীয়বার তাঁরই ছেলে দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই দুটি বিপ্লব প্রমাণ করে, নতুন যুগে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের চেয়ে পার্লামেণ্টের মাধ্যমে দেশশাসনের দাবি আরও জোরালো। বোঝা যায়, মধ্যযুগের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা এখন বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

য়ুরোপে রেনেসাঁস বা নবজীবনের প্রথম স্ফুরণ দেখা যায় ইটালিতে। সেখান থেকে উত্তর য়ুরোপে ও ইংলণ্ডে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্বান জ্ঞানী শিল্পী সাহিত্যিক সকলকেই রেনেসাঁস বেশ কিছু দিয়েছিল। বণিক ব্যবসায়ীরাও প্রচুর লাভ করল, দেশ-বিদেশে বাণিজ্যতরী পাঠিয়ে। তৈরী হল টাকার বাজার। যারা ঘরে বসে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তাদের মূলধন খাটাতে লাগল জাহাজ ও নাবিক দিয়ে, অভিযান ফেরত এলে তারা লাভের মোটা অংশ আদায় করত। এই জন্য তাদের বলা হত 'স্লীপিং পার্টনার' অর্থাৎ ঘুমন্ত বা নিষ্কর্মা অংশীদার। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণ এই নতুন যুগ থেকে তেমন কিছু পেল না। উৎখাত কৃষক বেকার শ্রমিক ও ভবঘুরের দল কিছু সুরাহা করতে না পেরে দলে দলে শহরে ঢুকে পড়তে লাগল। ইংলণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়ে, যাকে সে দেশের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়, এই গরীব ও বেকার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। লোকে বলে, এরই আভাস নাকি পাওয়া যায় সেই বিখ্যাত ইংরাজী ছড়ায়—"হার্ক! হার্ক? দ্য ডগ্স ডু বার্ক, দ্য বেগার্স আর কামিং টু টাউন।" অর্থাৎ "ঐ শোনো, কুকুরগুলো ডাকছে। ভিখারীর দল চড়াও হয়ে শহরে ঢুকে পড়ল…" অবস্থা সামলাবার জন্য শেষে পার্লামেণ্টে 'গরীব আইন' (পুয়র ল') পাশ করতে হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। ১৪৫৩ সালে কি ঘটেছিল ?

২। কলম্বস কি কারণে বিশ্ববিখ্যাত ?

৩। কার নামে 'আমেরিকা' নামকরণ হয় ?

৪। ভাস্কো ডা গামা কোন্ পথে ভারতে আসেন ও কোথায় পেঁছান ?

৫। কারা ক্রীতদাস ব্যবসায় নেমেছিল ?

৬। কোন কোন অঞ্চলে শ্বেতকায় জাতিরা উপনিবেশ স্থাপন করে ?

৭। য়ুরোপের কোন দেশগুলি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে ?

৮। ঘুমন্ত অংশীদার কারা ? তারা কি করত।

বিষয়গত প্রশ্ন ঃ

১। আধুনিক যুগের প্রধান লক্ষণ কি, বুঝিয়ে দাও।

২। 'রেনেশাঁস' কথাটি ব্যাখ্যা কর।

৩। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের কি ফলাফল হয়েছিল ?

৪। জাতীয় রাষ্ট্র কোথায় কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?

৫। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট প্রথা কোন সময়ে ও কি ভাবে গড়ে ওঠে ?

৬। ইংলণ্ডে কয়বার প্রজাবিদ্রোহ হয় ? তার ফল কি হয়েছিল ?

৭। ইতিহাসে ভৌগোলিক আবিষ্কারের কি গুরুত্ব ?

৮। বিজ্ঞানচর্চার মূল ভিত্তি কি ? এই চর্চার ফলে কি সুবিধা হয়েছিল ?

৯। রেনেশাঁসের আবির্ভাব প্রথম কোন দেশে হয় ?

১০। কোন সময়ে 'গরীব আইন' পাশ হয় ?

———